বাঙ্গালার ইতি

দ্বিতীয় ভাগ।

সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি
লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের
অধিকার পর্য্যন্ত।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।

পঞ্চবিংশ সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৩৯।

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
NO. 148, BARANASI GHOSH'S STREET, JORASANKO.

1883.

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয় আবশ্যক বোধে গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। সিরাজ উদ্দৌলা, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; আর লার্ড বেণ্টিক, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে, ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সুতরাং এই পুস্তকে একোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মা

বাঙ্গালার ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দের ১০ই এপ্রিল, সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে দিল্লীর অধীশ্বর এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, নূতন নবাব তাঁহার নিকট সনন্দ প্রার্থনা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না।

তিনি, রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, আপন পিতৃব্যপত্নীর সমুদয় সম্পত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ, বোল বৎসর ঢাকার অধিপতি থাকিয়া, অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পত্নী তদীয় সমস্ত ধনের অধিকারিণী হয়েন। ঐ বিধবা নারী, আপন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহারা কার্য্যকালে পলায়ন করিল; সুতরাং তাঁহার সমুদয় ঐশ্বর্য্য নির্ব্বিবাদে নবাবের প্রাসাদে প্রেরিত

হইল, এবং তিনিও সহজে আপন বাসস্থান হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন।

রাজবল্লভ ঢাকায় নিবাইশ মহম্মদের সহকারী ছিলেন, এবং মুসলমানদিগের অধিকারসময়ের প্রথা অনুসারে, প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া অনেক ধনসঞ্চয় করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, নিবাইশ পরলোক যাত্রা করেন। তৎকালে আলীবর্দ্দি সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ, হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঐ সময়ে মুরশিদাবাদে উপস্থিত থাকাতে, সিরাজ উদ্দৌলা, তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া, তদীয় সম্পত্তি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঢাকায় লোক প্রেরণ করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, অগ্রে ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া, সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নৌকারোহণ পূর্ব্বক, গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ যাত্রাচ্ছলে, কলিকাতা পলায়ন করেন; এবং ১৭ই মার্চ্চ তথায় উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ড্রেক সাহেবের অনুমতি লইয়া, নগর মধ্যে বাস করেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাবৎ পিতার মুক্তিসংবাদ না পান, তত দিন ঐ স্থানে অবস্থিতি করিবেন।

রাজবল্লভের সম্পত্তি এইরূপে হস্তবহির্ভূত হওয়াতে, সিরাজ উদ্দৌলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে সিংহাসনারূঢ় হইয়া, কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া, কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, ঐ দূত বিশ্বাসযোগ্য পত্রাদি প্রদর্শন করিতে না পারিবাতে, ড্রেক সাহেব তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিছু দিন পরে, ইয়ুরোপ হইতে এই সংবাদ আসিল, অল্প কালের মধ্যে, ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তৎকালে ফরাসিরা করমণ্ডল উপকূলে অত্যন্ত প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন; আর, কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত ইয়ুরোপীয় সৈন্য ছিল, চন্দন নগরে ফরাসিদের তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক থাকে। এই সমস্ত কারণে, কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা আপনাদের দুর্গ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপার, অনতিবিলম্বে, অল্পবয়স্ক উদ্ধতস্বভাব নবাবের কর্ণগোচর হইল। ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষ ছিল, এজন্য, তিনি ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ড্রেক সাহেবকে এই পত্র লিখিলেন, আপনি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পাইবেন না, বরং পুরাতন যাহা আছে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, এবং অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে আমার লোকের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

আলিবর্দ্দির মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্ব্বে, সিরাজ উদ্দৌলার দ্বিতীয় পিতৃব্য সায়দ মহম্মদের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র সকতজঙ্গ তদীয় সমস্ত সৈন্য, সম্পত্তি, ও পূর্ণিয়ার রাজত্বের অধিকারী হয়েন। সুতরাং সকতজঙ্গ, সিরাজ উদ্দৌলার সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপ নির্ব্বোধ, নৃশংস, ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন; সুতরাং, অধিক কাল তাঁহাদের পরস্পর সম্প্রীতি ও ঐকবাক্য থাকিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

সিরাজ উদ্দৌলা, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতামহের পুরাণ কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন।

কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয়, অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতি দিন তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল। সেই সকল পরামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল, যে তৎকালে প্রায় কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।

রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপাততঃ সকতজঙ্গকেই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, তিনি সিরাজ উদ্দৌলা অপেক্ষা ভদ্র নহেন; কিন্তু মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, আপাততঃ, এই উপায় দ্বারা উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে কোনও যথার্থ ভদ্র ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন।

এ বিষয়ে সমুদয় পরামর্শ স্থির হইলে, সকতজঙ্গের সুবাদারীর সনন্দ প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল। আবেদন পত্রে বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদানের প্রস্তাব থাকাতে, অনায়াসেই তাহাতে সম্রাটের সম্মতি হইল।

সিরাজ উদ্দৌলা, এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সকতজঙ্গের প্রাণদণ্ডার্থে পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সৈন্য সকল, রাজমহলে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে নবাব, কলিকাতার ড্রেক সাহেবের নিকট হইতে, আপন পূর্ব্ব-

প্রেরিত পত্রের এই উত্তর পাইলেন, আমি আপনকার আজ্ঞায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না।

এই উত্তর পাইয়া, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের বিরুদ্ধাচারীদিগকে আশ্রয় দিতেছে, এবং আমার অধিকার-মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে; অতএব, আমি তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিব; এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সৈন্যদিগকে অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন; কাশিম বাজারে ইঙ্গরেজদিগের যে কুঠী ছিল, আগমনকালে তাহা লুঠ করিলেন, এবং তথায় যে যে ইয়ুরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইলেন, সকলকেই কারারুদ্ধ করিলেন।

কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা ষাটি বৎসরের অধিক কাল নিরুপদ্রবে ছিলেন; সুতরাং, বিশেষ আস্থা না থাকাতে তাঁহাদের দুর্গ একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আপনাদিগকে এত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন, যে দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে, বিংশতি ব্যামের মধ্যেও, অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলন। তৎকালে দুর্গমধ্যে একশত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন ইয়ুরোপীয়। বারুদ পুরাণ ও নিস্তেজ; কামান সকল মরিচাধরা। এ দিকে, সিরাজ উদ্দৌলা চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও উত্তম উত্তম কামান লইয়া, কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। ইঙ্গরেজেরা দেখিলেন, আক্রমণ নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই; অতএব, সন্ধি প্রার্থনায় বারংবার পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদানেরও প্রস্তাব করি-

লেন। কিন্তু নবাবের অন্য কোনও বিষয়ে কর্ণ দিতে ইচ্ছা ছিল না; তিনি ইঙ্গরেজদিগকে একবারে উচ্ছিন্ন করিবার মানস করিয়াছিলেন; অতএব, পত্রের কোনও উত্তর না দিয়া, অবিশ্রামে কলিকাতা অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

১৬ই জুন, তাঁহার সৈন্যের অগ্রসর ভাগ চিত্রপুরে উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজেরা ইতিপূর্ব্বে তথায় এক উপদুর্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা নবাবের সৈন্যের উপর এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, তাহারা হটিয়া গিয়া দমদমায় অবস্থিতি করিল।

নবাবের সৈন্যেরা, ১৭ই জুন, নগর বেষ্টন করিয়া, তৎপর দিন, এক কালে চারি দিকে আক্রমণ করিল। তাহারা ভিত্তিসন্নিহিত গৃহ সকল অধিকার করিয়া, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, এক ব্যক্তিও সাহস করিয়া গড়ের উপর দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ দিবস, অনেক ব্যক্তি হত ও অনেক ব্যক্তি আহত হইল, এবং দুর্গের বহির্ভাগ বিপক্ষের হস্তগত হওয়াতে, ইঙ্গরেজদিগকে দুর্গের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে হইল। রাত্রিতে, বিপক্ষেরা দুর্গের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অতি বৃহৎ কতিপয় গৃহে অগ্নি প্রদান করিল; ঐ সকল গৃহ অতি ভয়ানক রূপে জ্বলিত হইতে লাগিল।

অতঃপর কি করা উচিত, ইহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত, দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজেরা সমবেত হইলেন। তৎকালীন সেনাপতিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও কার্য্যজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা সকলে কহিলেন, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই। বিশেষতঃ, এত অধিক এতদ্দেশীয় লোক দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল যে, তন্মধ্যে যে আহারসামগ্রী ছিল, তাহাতে

এক সপ্তাহও চলিতে পারিত না। অতএব নির্দ্ধারিত হইল, গড়ের নিকট যে সকল নৌকা প্রস্তুত আছে পর দিন প্রত্যূষে, নগর পরিত্যাগ করিয়া, তদ্দ্বারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দুর্গ মধ্যে এক ব্যক্তিও এমন ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না যে, এই ব্যাপার সুশৃঙ্খল রূপে সমাধা করিয়া উঠেন। সকলেই আজ্ঞা প্রদানে উদ্যত; কেহই আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত নহে।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে প্রেরণ করা গেল। অনন্তর, দুর্গস্থিত সমুদয় লোক ও নাবিকগণ ভয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইল। সকল ব্যক্তিই তীরাভিমুখে ধাবমান। নাবিকেরা নৌকা লইয়া পলাইতে উদ্যত। ফলতঃ সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত। যে, যে নৌকা সম্মুখে পাইল, তাহাতেই আরোহণ করিল। সর্ব্বাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব, ও সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলেন। যে কয়েক খান নৌকা উপস্থিত ছিল, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, কতক জাহাজের নিকটে ও কতক হাবড়া পারে চলিয়া গেল; কিন্তু সৈন্য ও ভদ্র লোক অর্দ্ধেকেরও অধিক দুর্গ মধ্যে রহিয়া গেল।

সর্ব্বাধ্যক্ষ সাহেবের পলায়নসংবাদ প্রচার হইবা মাত্র, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, একত্র হইয়া, হালওয়েল সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ স্থির করিলেন। পলায়িতেরা, জাহাজে আরোহণ করিয়া, প্রায় এক ক্রোশ ভাটিয়া গিয়া, নদীতে নঙ্গর করিয়া রহিল। ১৯এ জুন, বিপক্ষেরা পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল; কিন্তু পরিশেষে অপসারিত হইল।

দুর্গবাসীরা দুই দিবস পর্য্যন্ত আপনাদের রক্ষা করিল,

এবং জাহাজস্থিত লোকদিগকে অনবরত এই সঙ্কেত করিতে লাগিল, তোমরা আসিয়া আমাদের উদ্ধার কর। এই উদ্ধারক্রিয়া অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু পলায়িত ব্যক্তিরা পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থে এক বারও উদ্যোগ পাইল না। যাহা হউক, তখনও তাহাদের অন্য এক আশা ছিল। রয়েল জর্জ্জ নামে এক খান জাহাজ চিতপুরের নীচে নঙ্গর করিয়া ছিল। হালওয়েল সাহেব, ঐ জাহাজ গড়ের নিকটে আনবার নিমিত্ত দুই জন ভদ্র লোককে পাঠাইয়া দিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে উহা আসিবার সময় চড়ায় লাগিয়া গেল। এই রূপে দুর্গস্থিত হতভাগ্যদিগের শেষ আশাও উচ্ছিন্ন হইল।

১৯এ জুন, রাত্রিতে বিপক্ষেরা, দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ অবশিষ্ট গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া ২০এ, পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম সহকারে আক্রমণ করিল। হালওয়েল সাহেব, আর নিবারণচেষ্টা করা ব্যর্থ বুঝিয়া, নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। দুই প্রহর চারিটার সময়, এক জন শত্রুপক্ষীয় সৈনিক পুরুষ, কামান বন্ধ করিতে সঙ্কেত করিল; তাহাতে ইঙ্গরেজেরা, সেনাপতির উত্তর আসিল বোধ করিয়া, আপনাদের কামান ছোড়া রহিত করিলেন। তাঁহারা এইরূপ করিবা মাত্র, বিপক্ষেরা প্রাচীরের নিকট দৌড়িয়া আসিল, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গ অধিকার করিয়া লুঠ আরম্ভ করিল।

বেলা পাঁচটার সময়, সিরাজ উদ্দৌলা চৌপালায়

চড়িয়া, দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হইলে, ইয়ুরোপীয়েরা তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। হালওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বদ্ধ ছিল, নবাব, খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার একটি কেশও স্পর্শ করা যাইবেক না. অনন্তর বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, এত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কি রূপে চারি শত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত এত ক্ষণ যুদ্ধ করিল। পরে, অনাবৃত প্রদেশে সভা করিয়া, তিনি কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। নবাব যে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া তাহার এক প্রধান কারণ। তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড করিবেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া তাঁহাকে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন।

বেলা ছয় সাত ঘণ্টার সময়, নবাব, সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া, শিবিরে গমন করিলেন। সমুদয়ে এক শত ছচল্লিশ জন ইয়ুরোপীয় বন্দী ছিল। সেনাপতি সে রাত্রি তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এমন স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্গের মধ্যে দীর্ঘে বার, প্রস্থে নয়, হস্ত প্রমাণ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহে এক এক দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ থাকে। ইঙ্গরেজেরা কলহকারী দুরন্ত সৈনিকদিগকে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মুসলমানেরা, ঐ দারুণ গ্রীষ্মসময়ে, সমস্ত ইয়ুরোপীয় বন্দীদিগকে তাদৃশ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

সে রাত্রিতে যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। বন্দীরা অতি

ত্বরায় ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল। তাহারা রক্ষক-দিগের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া যে জল পাইল, তাহাতে কেবল তাহাদিগকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্যক রূপে নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার আশয়ে, গবাক্ষের নিকট যাইবার নিমিত্ত বিবাদ করিতে লাগিল, এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রক্ষীদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তোমরা গুলি করিয়া আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান কর। এক এক জন করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েক জন জীবিত থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে, ঐ গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, দৃষ্ট হইল, এক শত ছচল্লিশের মধ্যে তেইশ জন মাত্র জীবিত আছে। অন্ধকূপহত্যা নামে যে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে, সে এই। এই হত্যার নিমিত্তই, সিরাজ উদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে; উক্ত ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই বৃত্তান্ত লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, এবং সিরাজ উদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি, পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব, তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।

২১এ জুন, প্রাতঃকালে এই নিদারুণ ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অত্যন্ত অনবধান প্রদর্শন করিলেন।

অন্ধকূপে রুদ্ধ হইবা যে কয়েক ব্যক্তি জীবিত থাকে, হাল্‌ওয়েল সাহেব তাহাদের মধ্যে এক জন। নবাব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনাগার দেখাইয়া দিতে কহিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু ধনাগার মধ্যে পঞ্চাশ সহস্রেব অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

সিরাজ উদ্দৌলা, নয় দিবস, কলিকাতার সান্নিধ্যে থাকিলেন; অনন্তর, কলিকাতার নাম আলীনগর রাখিয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন। ২রা জুলাই, গঙ্গা পার হইয়া, তিনি হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লোক দ্বারা ওলন্দাজ ও ফরাসি দিগের নিকট কিছু কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, যদি অস্বীকার কর, তোমাদেরও ইঙ্গরেজদের মত দুরবস্থা করিব। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ, আর ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ, টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

যে বৎসর কলিকাতা পরাজিত হইল, ও ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, দিনামারেরা, এই দেশে বাসের অনুমতি পাইয়া, শ্রীরামপুর নগর সংস্থাপন করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া, পূর্ণিয়ার অধিপতি পিতৃব্যপুত্র সকতজঙ্গকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। বিবাদ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত, আপন এক ভৃত্যকে ঐ প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, পিতৃব্যপুত্রকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি অবিলম্বে ইহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার দিবে। ঐ উদ্ধত যুবা, পত্র পাঠে

ক্রোধান্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, উত্তর লিখিলেন, আমি সমস্ত প্রদেশের যথার্থ অধিপতি, দিল্লী হইতে সনন্দ পাইয়াছি; অতএব, আজ্ঞা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।

এই উত্তর পাইয়া, সিরাজ উদ্দৌলা, ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন, এবং অতি ত্বরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সকতজঙ্গও, এই সংবাদ পাইয়া, সৈন্য লইয়া তদভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকতজঙ্গ নিজে যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না, এবং কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্য সহিত এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানের সম্মুখে জলা, পার হইবার নিমিত্ত মধ্যে এক মাত্র সেতু ছিল। সৈন্য সকল সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু তদীয় সৈন্য মধ্যে এক ব্যক্তিও উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন না, এবং অনুষ্ঠানেরও কোন পরিপাটী ছিল না। প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন সুবিধা অনুসারে, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সেনা নিবেশিত করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য, ঐ জলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সকতজঙ্গের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। বড় বড় কামানের গোলাতে তদীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে, তিনি, নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায়, স্বীয় অশ্বারোহীদিগকে, জলা পার হইয়া, বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা, অতি কষ্টে কর্দ্দম পার হইয়া, শুষ্ক স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র, সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য অতি ভয়ানক রূপে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে সকতজঙ্গ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং অত্যধিক সুরাপান করিয়া এমন মত্ত হইলেন যে, আর সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তাঁহার সেনাপতিরা আসিয়া তাঁহাকে, রণস্থলে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে, ধরিয়া থাকিবার নিমিত্ত এক ভৃত্যসমেত, তাহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া, জলার প্রান্ত ভাগে উপস্থিত করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র, শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যেরা, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। দুই দিবস পরে, নবাবের সেনাপতি মোহনলাল পূর্ণিয়া অধিকার করিলেন, এবং তথাকার ধনাগারে প্রাপ্ত ন্যূনাধিক নবতি লক্ষ টাকা ও সকতজঙ্গের যাবতীয় অন্তঃপুরিকাগণ মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা সাহস করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, তিনি রাজমহলের অধিক যান নাই। কিন্তু এই জয়ের সমুদয় বাহাদুরী আপনার বোধ করিয়া, মহাসমারোহে মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে, ড্রেক সাহেব, কাপুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক, স্বদেশীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া, মান্দ্রাজে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, এবং স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত নদীমুখে জাহাজেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তথায় অনেক ব্যক্তি রোগাভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

কলিকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিলে, তথা-

কার গবর্ণর ও কৌন্সিলের সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং চারি দিকে বিপদসাগর দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে, ফরাসিদিগের সহিত ত্বরায় যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। ফরাসিরা তৎকালে পণ্ডিচরীতে অত্যন্ত প্রবল ছিলেন; ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য অতি অল্প মাত্র ছিল। তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালার সাহায্য করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তদনুসারে, তাঁহারা অতি ত্বরায় কতিপয় যুদ্ধজাহাজ ও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং এড্‌মিরল ওয়াট্‌সন সাহেবকে জাহাজের কর্ত্তৃত্ব দিয়া, আর কর্ণেল ক্লাইব সাহেবকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া, বাঙ্গালায় পাঠাইলেন।

ক্লাইব, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কোম্পানির কেরাণি নিযুক্ত হইয়া, ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু সাংগ্রামিক ব্যাপারে গাঢ়তর অনুরাগ থাকাতে, প্রার্থনা করিয়া সেনাসংক্রান্ত কর্ম্মে নিবিষ্ট হয়েন, এবং অল্প কাল মধ্যে, এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। এই সময়ে, তিনি বয়সে যুবা, কিন্তু অভিজ্ঞতাতে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে উদ্যোগ করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়, এজন্য জাহাজ সকল অক্টোবরের পূর্ব্বে বহির্গত হইতে পারিল না। তৎকালে উত্তরপূর্ব্বীয় বায়ুর সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছিল; এ প্রযুক্ত, জাহাজ সকল ছয় সপ্তাহের ন্যূনে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিল না, তন্মধ্যে দুই খানার আরও অধিক বিলম্ব হইয়াছিল।

কলিকাতার উদ্ধারার্থে মান্দ্রাজ হইতে সমুদয়ে ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাই প্রেরিত হয়। তাহারা, ২০এ

ডিসেম্বর, ফল্তায়, ও ২৮ এ, মায়াপুরে পঁহুছিল। তৎকালে মায়াপুরে মুসলমানদিগের এক দুর্গ ছিল। কর্ণেল ক্লাইব শেষোক্ত দিবসে রজনীযোগে স্বীয় সমস্ত সৈন্য তীরে অবতীর্ণ করিলেন, কিন্তু পথদর্শকদিগের দোষে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে, ঐ দুর্গের নিকট পঁহুছিতে পারিলেন না।

নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদ, কলিকাতা হইতে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে নবাবের সৈন্যেরা যদি প্রকৃত রূপে কার্য্য সম্পাদন করিত, তাহা হইলে, ইঙ্গরেজেরা নিঃসন্দেহ পরাজিত হইতেন। যাহা হউক, ক্লাইব অতি ত্বরায় কামান আনাইয়া শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে এক গোলা মাণিকচাঁদের হাওদার ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, তিনি যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরিশেষে, কলিকাতায় থাকিতেও সাহস না হওয়াতে, তথায় কেবল পাঁচ শত সৈন্য রাখিয়া, আপন প্রভুর নিকটস্থ হইবার মানসে, তিনি অতি সত্বর মুরসিদাবাদ প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, ক্লাইব স্থলপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জাহাজ সকল তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই তথায় পঁহুছিয়াছিল। ওয়াট্‌সন সাহেব, কলিকাতার উপর ক্রমাগত দুই ঘণ্টা কাল গোলাবৃষ্টি করিয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারি, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এই রূপে, ইঙ্গরেজেরা পুনর্ব্বার কলিকাতায় অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, অথচ স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তিরও প্রাণহানি হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্লাইব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয় প্রদর্শন না করিলে, নবাব কদাচ সন্ধি করিতে চাহিবেন না। অতএব তিনি, কলিকাতা উদ্ধারের দুই দিবস পরে, যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া হুগলী অধিকার করিলেন। তৎকালে এই নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।

বোধ হইতেছে, কলিকাতা অধিকার হইবার অব্যবহিত পরে, ক্লাইব মুরশিদাবাদের শেঠদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যে তাঁহারা, মধ্যস্থ হইয়া, নবাবের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি করিয়া দেন। তদনুসারে তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সিরাজ উদ্দৌলাও প্রথমতঃ প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাদের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইব, হুগলী অধিকার করিয়া, তথাকার বন্দর লুঠ করিয়াছেন ইহা শুনিবা মাত্র, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, সসৈন্যে অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি, ৩০এ জানুয়ারি হুগলীর ঘাটে গঙ্গা পার হইলেন, এবং ২রা ফেব্রুয়ারি, কলিকাতার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবের ছাউনির এক পোয়া অন্তরে শিবির নিবেশন করিলেন।

ক্লাইব, ৭০০ গোরা ও ১২০০ সিপাই, এই মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র।

সিরাজ উদ্দৌলা পঁহুছিবা মাত্র, ক্লাইব সন্ধিপ্রার্থনার

তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নবাবের সহিত দূতদিগের অনেক বার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, নবাব যদিও মুখে সন্ধির কথা কহিতেছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া, কলিকাতার চারি দিকের লোক ভয়ে পলায়ন করাতে, ইঙ্গরেজদিগের আহারসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। অতএব ক্লাইব, এক উদ্যমেই, নবাবকে আক্রমণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে, ওয়াট্‌সন সাহেবের জাহাজে গিয়া, তাঁহার নিকট ছয় শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, রাত্রি একটার সময়, তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। দুইটার সময়, সমুদয় সৈন্য স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল, এবং চারিটার সময়, এক বারে নবাবের ছাউনির দিকে যাত্রা করিল। সৈন্য সমুদয়ে ১৩৫০ গোরা ও ৮০০ সিপাই। অকুতোভয় ক্লাইব, সাহসে নির্ভর করিয়া, এই মাত্র সৈন্য লইয়া, বিংশতি গুণ অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে চলিলেন।

শীত কালের শেষে, প্রায় প্রতিদিন কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। সে দিবসও প্রভাত হইবা মাত্র, এমন নিবিড় কুজ্ঝটিকা হইল যে, কোনও ব্যক্তি, আপনার সম্মুখের বস্তুও দেখিতে পায় না। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা, যুদ্ধ করিতে করিতে, বিপক্ষের শিবির ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। হত ও আহত সমুদয়ে তাঁহাদের দুই শত বিংশতি জন মাত্র সৈন্য নষ্ট হয়। কিন্তু নবাবের তদপেক্ষায় অনেক অধিক লোক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নবাব, ক্লাইবের ঈদৃশ অসম্ভব সাহস দর্শনে, অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, কেমন ভয়ানক শত্রুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চারি ক্রোশ দূরে গিয়া ছাউনি করিলেন। ক্লাইব দ্বিতীয় বার আক্রমণের সমুদয় উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নবাব, তদীয় অসম্ভব সাহস ও অকুতোভয়তা দর্শনে, যুদ্ধের বিষয়ে এত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, যে, সন্ধির বিষয়েই সম্মত হইয়া, ৯ই ফেব্রুয়ারি, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গরেজেরা, পূর্ব্বের ন্যায়, সমুদয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অধিকন্তু, কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন; আর, তাঁহাদের পণ্য দ্রব্যের শুল্কদান রহিত হইল। নবাব ইহাও স্বীকার করিলেন, কলিকাতা আক্রমণ কালে যে সকল দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, সমুদয় ফিরিয়া দিবেন; আর যাহা যাহা নষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয়ের যথোপযুক্ত মূল্য ধরিয়া দিবেন।

ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, এই ভাবিয়া নবাব এই সকল নিয়ম তৎকালে অত্যন্ত অনুকূল বোধ করিলেন। আর ক্লাইবও এই বিবেচনা করিয়া সন্ধিপক্ষে নির্ভর করিলেন, যে ইয়ুরোপে ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; আর কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত ইয়ুরোপীয় সৈন্য আছে, চন্দন নগরে ফরাসিদিগেরও তত আছে। অতএব, চন্দন নগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে, নবাবের সহিত নিষ্পত্তি করিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক।

ইঙ্গরেজ ও ফরাসি এই উভয় জাতির ইয়ুরোপে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, ক্লাইব, চন্দননগরবাসী ফরাসিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, ইয়ুরোপে যেরূপ হউক, ভারতবর্ষে আমরা কেহ কোনও পক্ষকে আক্রমণ করিব না। তাহাতে চন্দন নগরের গবর্ণর উত্তর দিলেন যে, আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যদি প্রধান পদারূঢ় কোনও ফরাসি সেনাপতি আইসেন, তিনি এরূপ সন্ধিপত্র অস্বীকার করিতে পারেন।

ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, যাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, এরূপ নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব। আর, যত দিন চন্দন নগরে ফরাসিদের অধিক সৈন্য থাকিবেক, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত, কলিকাতা নিরাপদ হইবেক না। তিনি ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে সিরাজ উদ্দৌলা কেবল ভয় প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন, সুযোগ পাইলে, নিঃসন্দেহ, যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। বস্তুতঃ, সিরাজ উদ্দৌলা এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের উচ্ছেদের মন্ত্রণা করিতেছিলেন; এবং যুদ্ধকালে ফরাসিদিগের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসিদিগকে আক্রমণ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। কিন্তু, এ বিষয়ে অনুমতির নিমিত্ত, তিনি যত বার প্রার্থনা করিলেন, প্রত্যেক বারেই নবাব কোনও স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। পরিশেষে, ওয়াট্‌সন সাহেব নবাবকে এই ভাবে পত্র লিখিলেন, আমার যত সৈন্য আসিবার কল্পনা

ছিল, সমুদয় আসিয়াছে; এক্ষণে আপনকার রাজ্যে এমন প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিব যে, সমুদয় গঙ্গার জলেও নির্ব্বাণ হইবেক না। সিরাজ উদ্দৌলা, এই পত্র পাঠে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ্চ, বিনয় করিয়া, এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষে এই কথা লিখিত ছিল, যাহা আপনকার উচিত বোধ হয়, করুন।

ক্লাইব ইহাকেই ফরাসিদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি গণনা করিয়া লইলেন, এবং অবিলম্বে সৈন্য সহিত স্থলপথে চন্দননগর যাত্রা করিলেন। ওয়াট্‌সন সাহেবও সমস্ত যুদ্ধজাহাজ সহিত, জলপথে প্রস্থান করিয়া, ঐ নগরের নিকটে নঙ্গর করিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য চন্দন নগর অবরোধ করিল। ক্লাইব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা সহকারে, অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জাহাজী সৈন্যের প্রযত্নেই ঐ স্থান হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজেরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। নয় দিন অবরোধের পর চন্দন নগর পরাজিত হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, ইঙ্গরেজেরা ফরাসি সৈন্য ও সেনাপতি দিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই চন্দন নগর পরাজিত হয়। এই প্রবাদের মূল এই, ফরাসি গবর্ণর, ইঙ্গরেজদিগের জাহাজের গতি প্রতিরোধের নিমিত্ত, নৌকা ডুবাইয়া গঙ্গার প্রায় সমুদয় অংশ রুদ্ধ করিয়া, কেবল এক অল্পপরিসর পথ রাখিয়াছিলেন। এই বিষয় অতি অল্প লোকে জানিত। ফরাসিদিগের এক কর্ম্মচারী ছিল, তাহার নাম টেরেনো।

টেরেনো, কোনও কারণ বশতঃ, ফরাসি গবর্ণর রেনড সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসে, এবং ক্লাইবকে ঐ পথ দেখাইয়া দেয়। উত্তর কালে ঐ ব্যক্তি ইঙ্গরেজদিগের নিকট কর্ম্ম করিয়া কিছু উপার্জ্জন করে, এবং ঐ উপার্জ্জিত অর্থের কিয়ৎ অংশ ফ্রান্সে আপন রদ্ধ পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার পিতা এই টাকা গ্রহণ করেন নাই, বিশ্বাসঘাতকের দত্ত বলিয়া, ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক ফিরিয়া পাঠান। ইহাতে টেরেনোর অন্তঃকরণে এমন নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় যে, সে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

সিরাজ উদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা ইঙ্গরেজেরা টাকশাল ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পান। ষাটি বৎসরের অধিক হইবেক, তাঁহারা, এই দুই বিষয়ের নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কালিকাতার যে পুরাতন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করেন, তাহা অতি গোপনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে, ক্লাইব, এই সন্ধির পরেই এতদ্দেশীয় সৈন্যে পরাজয় করিতে না পারে, এরূপ এক দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার সমাধান বিষয়ে অত্যন্ত সত্বর ও সযত্ন হইলেন। যখন নক্সা প্রস্তুত করিয়া আনে, তখন তিনি, তাহাতে কত ব্যয় হইবেক, বুঝিতে পারেন নাই। কার্য্য আরম্ভ হইলে, ক্রমে দৃষ্ট হইল, দুই কোটি টাকার ন্যূনে নির্ব্বাহ হইবেক না। কিন্তু তখন আর তাহার কোনও পরিবর্ত্ত করিবার উপায় ছিল না। কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্গ এই রূপে দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই, এক

টাকশাল নির্ম্মিত, এবং আগষ্ট মাসের ঊনবিংশ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের টাকা প্রথম মুদ্রিত হয়।

ক্লাইব, এই রূপে পরাক্রম দ্বারা ইঙ্গরেজদিগের অধিকার পুনঃস্থাপিত করিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, পরাক্রম ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে এ অধিকার রক্ষা হইবেক না। তিনি প্রথম অবধিই নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেক না, অবশ্য তাহাদিগকে অন্য অন্য উপায় দেখিতে হইবেক। আর, ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য পাইলে, নবাব দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবেন। অতএব, যাহাতে ফরাসিরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালাতে প্রবেশ করিতে না পায়, এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলেন।

তৎকালে দক্ষিণ রাজ্যে ফরাসিদিগের বুসি নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। সিরাজ উদ্দৌলা, ইঙ্গরেজদিগের প্রতি মুখে বন্ধুত্ব দর্শাইতেন; কিন্তু ঐ ফরাসি সেনাপতিকে সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় আসিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, পত্র দ্বারা বারংবার আহ্বান করিতেছিলেন। নবাব এ বিষয়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খান ক্লাইবের হস্তে আইসে। ইঙ্গরেজেরা সিরাজ উদ্দৌলাকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি তাঁহাদের প্রতি অক্রোধ হইতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিত। অর্ব্বাচীন নির্ব্বোধ নবাব ক্রোধোদয় কালে উন্মত্ত প্রায় হইতেন; কিন্তু ক্রোধ নিবারণ হইলে, ইঙ্গরেজদিগের ভয় তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত

হইত। ওয়াট্‌স নামে এক সাহেব তাঁহার দরবারে ইঙ্গরেজ-দিগের রেসিডেণ্ট ছিলেন। নবাব, এক দিন, তাঁহাকে শূলে দিব বলিয়া ভয় দেখাইতেন, দ্বিতীয় দিন, তাঁহার নিকট মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার পাঠাইতেন; এক দিন, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, ক্লাইবের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, দ্বিতীয় দিন, বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে পত্র লিখিতেন।

ইঙ্গরেজেরা বুঝিতে পারিলেন, যাবৎ এই দুর্দ্দান্ত বালক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবেক, তাবৎ কোনও প্রকারে ভদ্রস্থতা নাই। অতএব, তাঁহারা কি উপায়ে নিরাপদ হইতে পারেন, মনে মনে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে দিল্লীর সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা, নবাবের সর্ব্বাধিকারী রাজা রায়দুর্লভ, সৈন্যদিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মীর জাফর, এবং উমিচাঁদ ও খোজা বাজীদ নামক দুই জন ঐশ্বর্য্যশালী বণিক ইত্যাদি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচার দ্বারা, তাঁহা-দের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহারা আপনাদের ধন, মান, জীবন সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতেন। পূর্ব্ব বৎসর, সকতজঙ্গকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার নিমিত্ত, সকলে একবাক্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে উদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহারা, সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, ইঙ্গরেজ-

দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনার গোপনে ঐ পত্র প্রেরণ করেন।

ইঙ্গরেজেরা বিবেচনা করিলেন, আমরা সাহায্য না করিলেও, এই রাজবিপ্লব ঘটিবেক, সাহায্য করিলে, আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তৎকালীন কৌন্সিলের মেম্বরেরা প্রায় সকলেই ভীরুস্বভাব ছিলেন; এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। এডমিরেল ওয়াট্‌সন সাহেবও বিবেচনা করিয়াছিলেন, যাহারা এ পর্য্যন্ত কেবল সামান্যাকারে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের পক্ষে দেশাধিপতিকে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হওয়া অত্যন্ত অসংসাহসের কর্ম। কিন্তু ক্লাইব অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; সঙ্কট পড়িলে, তাঁহার ভয় না জন্মিয়া, বরং সাহস ও উৎসাহের বৃদ্ধি হইত। তিনি উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইতে কোনও ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

ক্লাইব, এপ্রিল মে দুই মাস, মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট ওয়াট্‌স সাহেব দ্বারা, নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী-দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, এত গোপনে, যে সিরাজ উদ্দৌলা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই; এক বার মাত্র তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি মীর জাফরকে ডাকাইয়া কোরান স্পর্শ করাইয়া শপথ করান। জাফরও যথোক্ত প্রকারে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আমি কখনও কৃতঘ্ন হইব না।

সমুদয় প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে উমিচাঁদ সমুদয় উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা

আক্রমণ কালে, তাঁহার অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, এ নিমিত্ত মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা দিবার কথা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু তিনি, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, এক দিন বিকালে ওয়াট্‌স সাহেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, মীর জাফরের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে প্রতিজ্ঞাপত্র হইবেক, তাহাতে আমাকে আর ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিয়া দেখাইতে হইবেক, নতুবা আমি এখনই নবাবের নিকটে গিয়া সমুদয় পরামর্শ ব্যক্ত করিব। উমিচাঁদ এরূপ করিলে, ওয়াট্‌স প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইত। ওয়াট্‌স সাহেব, কালবিলম্বের নিমিত্ত, উমিচাঁদকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, অবিলম্বে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব প্রথমতঃ এক বারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধূর্ত্ততা ও প্রতারকতা বিষয়ে উমিচাঁদ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন। অতএব বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, উমিচাঁদ গর্হিত উপায় দ্বারা অর্থ লাভের চেষ্টা করিতেছে। এ ব্যক্তি সাধারণের শত্রু; ইহার দুষ্টতা দমনের নিমিত্ত, যে, কোনও প্রকার চাতুরী করা অন্যায় নহে। অতএব, আপাততঃ ইহার দাওয়া অঙ্গীকার করা যাউক। পরে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তে আসিবেক। তখন ইহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হইবেক না। এই স্থির করিয়া, তিনি, ওয়াট্‌স সাহেবকে উমিচাঁদের দাওয়া স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিয়া, দুই খান প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খান শ্বেত বর্ণের, দ্বিতীয় লোহিত বর্ণের। লোহিত পত্রে উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা

লেখা রহিল, শ্বেত পত্রে সে কথার উল্লেখ রহিল না। ওয়াট্‌সন সাহেব, ক্লাইবের ন্যায়, নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। তিনি প্রতারণাঘটিত লোহিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু উমিচাঁদ অত্যন্ত চতুর ও অত্যন্ত সতর্ক, তিনি, প্রতিজ্ঞাপত্রে ওয়াট্‌সনের নাম স্বাক্ষরিত না দেখিলে, নিঃসন্দেহ সন্দেহ করিবেন। ক্লাইব কোনও কর্ম্ম অঙ্গহীন করিতেন না, এবং অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই করিতে পারিতেন। তিনি ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিলেন। লোহিত পত্র উমিচাঁদকে দেখান গেল, এবং তাহাতেই তাহার মন সুস্থ হইল। অনন্তর, মীর জাফরের সহিত এই নিয়ম হইল, ইঙ্গরেজেরা যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি, স্বীয় প্রভুর সৈন্য হইতে আপনার সৈন্য পৃথক করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

এই রূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ক্লাইব সিরাজ উদ্দৌলাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, আপনি ইঙ্গরেজদিগের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সন্ধিপত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, যে যে ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা করেন নাই, এবং ইঙ্গরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, ফরাসিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব আমি স্বয়ং মুরশিদাবাদে যাইতেছি আপনকার সভার প্রধান প্রধান লোকদিগের উপর ভার দিব, তাঁহারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

নবাব, এই পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া, এবং ক্লাইব স্বয়ং আসিতেছেন ইহা পাঠ করিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হই-

লেন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অপরিহরণীয় স্থির করিয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্লাইবও ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসের আরম্ভে, আপন সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি ১৭ই জুন, কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন এবং পর দিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন।

১৯এ জুন, ঘোরতর বর্ষা আরম্ভ হইল। ক্লাইব, পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করি, কি ফিরিয়া যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি তৎকাল পর্য্যন্ত মীর জাফরের কোনও উদ্দেশ পাইলেন না, এবং তাঁহার এক খানি পত্রিকাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি স্বীয় সেনাপতিদিগকে সমবেত করিয়া, পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। ক্লাইবও প্রথমতঃ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া, ভাগ্যে যাহা থাকে ভাবিয়া, যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, যদি এত দূর আসিয়া এখন ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে, বাঙ্গালাতে ইঙ্গরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইবেক।

২২এ জুন, সূর্য্যোদয় কালে, সৈন্য সকল গঙ্গা পার হইতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর চারিটার সময় সমুদয় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা, অবিশ্রান্ত গমন করিয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, পলাশির বাগানে উপস্থিত হইল।

প্রভাত হইবা মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্লাইব, উৎকণ্ঠিত

চিত্তে মীর জাফরের ও তদীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, সকলের পশ্চাদ্ভাগে তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। মীর মদন নামক এক জন সেনাপতি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মীর জাফর, আত্মসৈন্য সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময়, কামানের গোলা লাগিয়া, সেনাপতি মীর মদনের দুই পা উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দৃষ্টে নবাব যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং ভৃত্যদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন, তিনি মীর জাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া, অতিশয় দীনতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, অন্ততঃ আমার মাতামহের অনুরোধে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই বিষম বিপদের সময় সহায়তা কর।

জাফর অঙ্গীকার করিলেন, আমি আত্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিব, এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সৈন্য সকল ফিরাইয়া আনুন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, কল্য আমরা সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব। তদনুসারে

নবাব সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। নবাবের অপর সেনাপতি মোহনলাল ইঙ্গরেজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু নবাবের এই আজ্ঞা পাইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন। তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইল। তাহারা ভঙ্গ দিবা চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং, ক্লাইবের অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। যদি মীর জাফর বিশ্বাস ঘাতক না হইতেন, এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের কোনও ক্রমে জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর, সিরাজ উদ্দৌলা, এক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করতঃ, পর দিন বেলা ৮টার সময়, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই, আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সন্নিধানে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নবাব সমস্ত দিন একাকী আপন প্রাসাদে কাল যাপন করিলেন; পরিশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া, রাত্রি তিনটার সময়ে, মহিষীগণ ও কতিপয় প্রিয়পাত্র সমভিব্যাহারে করিয়া, শকটারোহণ পূর্ব্বক ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, ফরাসি সেনাপতি লা সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, তিনি নৌকারোহণ পূর্ব্বক জলপথে প্রস্থান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে,

তিনি, ঐ সেনাপতিকে পাটনা হইতে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

পলাশির যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের, হত আহত সমুদয়ে, কেবল কুড়ি জন গোরা ও পঞ্চাশ জন সিপাই নষ্ট হয়। যুদ্ধসমাপ্তির পর, মীর জাফর, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার রণজয় নিমিত্ত সভাজন ও হর্ষ প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, উভয়ে একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, মীর জাফর রাজকীয় প্রাসাদ অধিকার করিলেন।

রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী সমবেত হইলেন। অবিলম্বে এক দরবার হইল। ক্লাইব, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মীর জাফরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সম্ভাষণ ও বন্দনা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে, কয়েক জন ইঙ্গরেজ এবং ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও তাঁহার মুন্সী নবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, ধনাগারে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু, তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ে দুই কোটি টাকার অধিক দেখিতে পাইলেন না।

তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন যে, উহা কেবল বাহ্য ধনগার মাত্র। এতদ্ভিন্ন, অন্তঃপুরে আর এক ধনাগার ছিল; ক্লাইব, তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পান নাই। ঐ কোষে স্বর্ণ, রজত ও রত্নে আট কোটি টাকার ন্যূন ছিল না। মীর জাফর, আমির বেগ খাঁ, রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ এই কয়েক জনে ঐ ধন ভাগ করিয়া লয়েন। এই

নির্দ্দেশ নিতান্ত অমূলক বা অসম্ভব বোধ হয় না; কারণ, রামচাঁদ তৎকালে ষাটি টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু দশ বৎসর পরে, তিনি এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া মরেন। মুন্সী নবকৃষ্ণেরও মাসিক বেতন ষাটি টাকার অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি, অল্প দিন পরে, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই ব্যক্তিই, পরিশেষে, রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, রাজা নবকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, বাণিজ্যের উচ্ছেদ এবং কর্ম্মচারীদিগের প্রাণদণ্ড হয়। বস্তুতঃ, তাঁহারা বাঙ্গালাতে এক বারে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধশূন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহারা কেবল আপনাদের কুঠী সকল পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন, এমন নহে, আপনাদের বিপক্ষ সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং অনুগত এক ব্যক্তিকে নবাবী পদ দিলেন, আর, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করাতে, কোম্পানি বাহাদুরের এবং ইঙ্গরেজ, বাঙ্গালি ও আরমানি বণিকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, সেই ক্ষতির পূরণ স্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুর, এক কোটি টাকা পাইলেন; ইঙ্গরেজ বণিকেরা পঞ্চাশ লক্ষ; বাঙ্গালি বণিকেরা বিশ লক্ষ; আরমানি বণিকেরা সাত লক্ষ। এ সমস্ত ভিন্ন, সৈন্যসংক্রান্ত লোকেরা অনেক পারিতোষিক পাইলেন। আর, কোম্পা-

নির যে সকল কর্ম্মচারীরা মীর জাফরকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বঞ্চিত হইলেন না। ক্লাইব ষোল লক্ষ টাকা পাইলেন; কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা কিছু কিছু ন্যূন পরিমাণে পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাও নির্দ্ধারিত হইল, পূর্ব্বে ইঙ্গরেজদিগের যে যে অধিকার ছিল, সে সমস্ত বজায় থাকিবেক, মহারাষ্ট্র-খাতের অন্তর্গত সমুদয় স্থান ও তাহার বাহ্যে ছয় শত ব্যাম পর্য্যন্ত, ইঙ্গরেজদিগের হইবেক; কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ কোম্পানির জমীদারী হইবেক, আর ফরাসিরা কোনও কালে এ দেশে বাস করিবার অনুমতি পাইবেন না।

এ দিকে, সিরাজ উদ্দৌলা, ভগবানগোলা হইতে রাজমহলে পঁহুছিয়া, আপন স্ত্রী ও কন্যার জন্য অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত, এক ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে ঐ ফকীরের উপর তিনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানকারীদিগকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পঁহুছসংবাদ দিলে, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। সপ্তাহ পূর্ব্বে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির সহিত আলাপও করিতেন না; এক্ষণে, অতি দীন বাক্যে তাহাদের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা, তদীয় বিনয়বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া, তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুঠিয়া লইল; এবং তাঁহাকে মুরশিদাবাদে প্রত্যানয়ন করিল।

যৎকালে, তিনি রাজধানীতে আনীত হইলেন, তখন মীর জাফর, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া, তন্দ্রাবেশে

ছিলেন. তাঁহার পুত্র পাপাত্মা মীরন, সিরাজ উদ্দৌলার উপস্থিতিসংবাদ শুনিয়া, তাঁহাকে আপন আলয় সন্নিধানে রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল, এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই, স্বীয় বয়স্যগণের নিকট তাঁহার প্রাণ বধের ভার লইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু তাহারা একে একে সকলেই অস্বীকার করিল। আলীবর্দ্দি খাঁ মহম্মদিবেগ নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, পরিশেষে সেই দুরাত্মাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপার সমাধানের ভার গ্রহণ করিল। সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, হতভাগ্য নবাব, তাহার আগমনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, করুণ স্বরে কহিলেন, আমি যে বিনা অপরাধে হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমায় অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবেক। তিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র, দুরাচার মহম্মদিবেগ তরবারি প্রহার দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। উপর্য্যুপরি কয়েক আঘাতের পর তিনি, হুসেন কুলি খাঁর প্রাণবধের প্রতিফল পাইলাম, এই বলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর, মীরনের আজ্ঞাবহেরা নবাবের মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিল এবং অযত্ন ও অবজ্ঞা পূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, কবর দিবার নিমিত্ত লইয়া চলিল। ঐ সময়ে, সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল, কোনও কারণ বশতঃ, পথের মধ্যে মাহুতের থামিবার আবশ্যক হওয়াতে, আঠার মাস পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলা যে স্থানে হুসেন কুলি খাঁর প্রাণ বধ করিয়াছিলেন, ঐ হস্তী ঠিক

সেই স্থানে দণ্ডায়মান হয়, এবং যে ভূভাগে, বিনা অপরাধে, তিনি হুসেনের শোণিতপাত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে তাঁহার খণ্ডিত কলেবর হইতে কতিপয় রুধির-বিন্দু নিপতিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

মীর জাফরের প্রভুত্ব এক কালে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা তিন প্রদেশে অব্যাহত রূপে অঙ্গীকৃত হইল। কিন্তু অতি অল্প কালেই প্রকাশ পাইল, তাঁহার কিছু মাত্র বিষয়বুদ্ধি নাই। তিনি স্বভাবতঃ নির্বোধ, নিষ্ঠুর ও অর্থলোভী ছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারীরা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবদিগের অধিকার কালে, অনেক ধন সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব হরণ মনস্থ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী রাজা রায় দুর্লভ কেবল অত্যন্ত ধনবান ছিলেন, এমন নহে, তাঁহার নিজের ছয় সহস্র সৈন্যও ছিল। মীর জাফর সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিলেন।

মীর জাফরকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিবার বিষয়ে, রাজা রায় দুর্লভ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। যখন সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হয়, রায় দুর্লভই চক্রান্তকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মীর জাফরকে নবাব করা উচিত। তথাপি মীর জাফর এক্ষণে রায় দুর্লভের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ, তাঁহার উপর মীর জাফরের এমন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার সহিত সিরাজ উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুতা আছে, এই সন্দেহ করিয়া, সেই অল্পবয়স্ক নিরপরাধ রাজকুমারের প্রাণ বধ করিলেন। রায় দুর্লভও, কেবল ইঙ্গরেজদিগের শরণাগত হইয়া, সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন।

রাজা রামনারায়ণ বহুকাল অবধি বিহারের ডেপুটী গবর্ণর ছিলেন। নবাব মনস্থ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তদীয় সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, ও আপন ভ্রাতাকে গবর্ণরী পদ দিবেন। ক্লাইবের মতে মীর জাফরের ভ্রাতা মীর জাফর অপেক্ষাও নির্বোধ। নবাব মেদিনীপুরের গবর্ণর রাজা রাম সিংহের ভ্রাতাকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন; তাহাতে রাম সিংহও তাঁহার প্রতি ভগ্নস্নেহ হইলেন। পুর্ণিয়ার ডেপুটী গবর্ণর অদল সিংহ, মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণা অনুসারে, রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিলেন।

এই রূপে, মীর জাফরের সিংহাসনারোহণের পর, পাঁচ মাসের মধ্যে, তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ ঘটিল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া, বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে ক্লাইব বাঙ্গালাতে সকলের বিশ্বাসভূমি ছিলেন। এই বিশ্বাস অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনি, উপস্থিত তিন বিদ্রোহের শান্তি করিলেন, অথচ এক বিন্দু রক্তপাত হইল না।

নবাব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করাতে, ক্লাইব পাটনা যাইবার সময় মুরশিদাবাদ হইয়া যান। নবাব, ইঙ্গরেজদিগকে যত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার অধিকাংশই পরিশোধ করেন নাই। ক্লাইব রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া নবাবকে জানাইলেন যে, সে সকল পরিশোধ করিবার কোনও বন্দোবস্ত করিতে হইবেক। নবাব তদনুসারে, দেয়পরিশোধ স্বরূপ, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও হুগলী এই তিন প্রদেশের রাজস্ব তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই বিষয় নিষ্পত্তি হইলে পর, ক্লাইব ও নবাব স্ব স্ব সৈন্য লইয়া পাটনা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাগত হইয়া কহিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা আমায় অভয়দান করেন, তাহা হইলে, আমি নবাবের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে পারি। ক্লাইব বিস্তর বুঝাইলে পর, নবাব রামনারায়ণের উপর অক্রোধ হইলেন। অনন্তর, রামনারায়ণ, মীর জাফরের শিবিরে গিয়া তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। মীর জাফর এ যাত্রা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। পরে ক্লাইব ও নবাব একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা রায় দুর্লভ পূর্ব্বাপর তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যাবৎ উপস্থিত আছেন, তত দিনই রক্ষার সম্ভাবনা।

পাটনার ব্যাপার এই রূপে নিষ্পন্ন হওয়াতে, জাফরের পুত্র মীরন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের পিতা পুত্রের এই অভিপ্রায় ছিল, পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন ও সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন। কিন্তু এ যাত্রায় তাহা না হইয়া বরং তাঁহাদের পরাক্রমের দৃঢ়ীকরণ হইল। তাঁহারা উভয়েই, ক্লাইবের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে, অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। মীর জাফর, শুনিতে তিন প্রদেশের নবাব ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই ছিলেন না, ক্লাইবই সকল ছিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে, ইঙ্গরেজদিগকে, নবাবের নিকট স্বপক্ষে একটি অনুকূল কথা বলাইবার নিমিত্ত, টাকা দিয়া যে সকল প্রধান লোকের উপাসনা করিতে হইত, এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তিকে ইঙ্গরেজদিগের উপাসনা করিতে

হইল। মুসলমানেরা দেখিতে লাগিলেন, চতুর হিন্দুরা, অকর্ম্মণ্য নবাবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্লাইবের নিকটেই সকল বিষয়ের প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ক্লাইব ঐ সকল বিষয়ে এমন বিজ্ঞতা ও বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন যে, যাবৎ তাঁহার হস্তে সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার ছিল, তাবৎ কোনও অংশে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই।

হতভাগ্য দিল্লীশ্বরের পুত্র শাহ আলম, প্রয়াগ ও অযোধ্যার সুবাদারের সহিত সন্ধি করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ দুই সুবাদারের, এই সুযোগে বাঙ্গালা রাজ্যের কোনও অংশ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় কি না, এই চেষ্টা দেখা যেরূপ অভিপ্রেত ছিল, উক্ত রাজকুমারের সাহায্য করা সেরূপ ছিল না। শাহ আলম ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, যদি আপনি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে ক্রমে ক্রমে এক এক প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিব। কিন্তু ক্লাইব উত্তর দিলেন, আমি মীর জাফরের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিব না। শাহ আলম, সম্রাটের সহিত বিবাদ করিয়া, তদীয় সম্মতি ব্যতিরেকে, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, সম্রাটও ক্লাইবকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি আমার বিদ্রোহী পুত্রকে দেখিতে পাইলে, রুদ্ধ করিয়া, আমার নিকট পাঠাইবে।

মীর জাফরের সৈন্য সকল, বেতন না পাওয়াতে, অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া ছিল; সুতরাং, সে সৈন্য দ্বারা উল্লিখিত

আক্রমণ নিবারণের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য, তাঁহাকে, উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, পুনর্ব্বার ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। তদনুসারে ক্লাইব, সত্বর হইয়া, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, পাটনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু, ক্লাইবের উপস্থিতির পূর্ব্বেই, এই ব্যাপার এক প্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রাজকুমার ও প্রয়াগের সুবাদার, নয় দিবস পাটনা অবরোধ করিয়াছিলেন। ঐ স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন, ইঙ্গরেজেরা আসিতেছেন, এবং অযোধ্যার সুবাদার, প্রয়াগের সুবাদারের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক, তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, প্রয়াগের সুবাদার, আপনার উপায় আপনি চিন্তা করুন এই বলিয়া, রাজকুমারের নিকট বিদায় লইয়া, স্বীয় রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত সত্বর হইলেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজকুমারের সৈন্যেরা অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; কেবল তিন শত ব্যক্তি তাঁহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিল। পরিশেষে তাঁহার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ক্লাইবের নিকট ভিক্ষার্থে লোক প্রেরণ করেন। ক্লাইব বদান্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, রাজকুমারকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

মীর জাফর, এই রূপে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ক্লাইবকে ওমরা উপাধি দিলেন, এবং, কোম্পানিকে নবাব সরকারে কলিকাতার জমীদারীর যে রাজস্ব দিতে হইত, তাহা তাঁহাকে জায়গীর

স্বরূপ দান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ রাজস্ব বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার ন্যূন ছিল না।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে, মীর জাফর কলিকাতায় আসিয়া ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তিনিও যৎপরোনাস্তি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তিনি তথায় থাকিতে থাকিতে, ওলন্দাজদিগের সাত খান যুদ্ধজাহাজ নদীমুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। ঐ সাত জাহাজে পঞ্চদশ শত সৈন্য ছিল। অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, ঐ সকল জাহাজ নবাবের সম্মতি ব্যতিরেকে আইসে নাই। ইঙ্গরেজদিগকে দমনে রাখিতে পারে, এরূপ এক দল ইয়ুরোপীয় সৈন্য আনাইবার নিমিত্ত, তিনি কিয়ৎ কাল অবধি চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। খোজাবাজীদ নামক কাশ্মীরদেশীয় বণিক এই সকল কুমন্ত্রণার সাধক হইয়াছিলেন।

খোজাবাজীদ আলীবর্দ্দি খাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। লবণব্যবসায় তাঁহার একচাটিয়া ছিল। তিনি এমন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন যে, সহস্র মুদ্রার ন্যূনে তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ হইত না। একদা তিনি নবাবকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি মুরশিদাবাদে ফরাসিদিগের এজেণ্ট ছিলেন; পরে, চন্দননগর পরাজয় দ্বারা তাঁহাদের অধিকার উচ্ছিন্ন হইলে, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসেন।

সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু, উক্ত নবাবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত ইঙ্গরেজদিগকে আহ্বান করিবার বিষয়ে, তিনিই প্রধান উদ্যোগী

হইয়াছিলেন। রাজবিপ্লবের পর, তিনি দেখিলেন যে ইঙ্গরেজদিগের নিকট যে সকল আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না; এজন্য, তাঁহাদের দমন করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক ওলন্দাজী সৈন্য আনয়ন বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন।

তৎকালে চুঁচুড়ার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল। গবর্ণর বিসদম সাহেব এক পক্ষের প্রধান। ইনি ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিতান্ত বাসনা, কোনও রূপে সন্ধি ভঙ্গ না হয়। বর্ণেট নামক এক ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রধান। এই পক্ষের লোকেরা অত্যন্ত উদ্ধত ছিলেন। তাঁহাদের মত অনুসারে, চুঁচুড়ার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গরেজেরা, আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, ওলন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, আপনারা এই নদীতে স্বজাতীয় সৈনিক রাখিতে পারিবেন না। ওলন্দাজেরা, বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, বটেবিয়াতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, এ দেশে এক্ষণে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এই সুযোগে আপনাদের অনেক ইষ্টসাধন করিতে পারা যাইবেক।

এই সৈন্যের উপস্থিতিসংবাদ অবগত হইয়া, ক্লাইব, অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে ওলন্দাজদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের সন্ধি ছিল। আর, তাঁহাদের যত ইয়ুরোপীয় সৈন্য থাকে, ইঙ্গরেজদিগের তাহার তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না। যাহা হউক, ক্লাইব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ পরাক্রম ও অকুতোভয়তা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব, বাঙ্গালাতে ফরাসিদিগের প্রাধান্য লোপ করিয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ওলন্দাজদিগকেও

প্রবল হইতে দিবেন না। এক্ষণে, তিনি মীর জাফরকে কহিলেন, আপনি ওলন্দাজী সৈন্যদিগকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন। নবাব কহিলেন, আমি স্বয়ং হুগলীতে গিয়া এ বিষয়ের শেষ করিব। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, আমি ওলন্দাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি, প্রস্থানের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই, তাঁহাদের সমুদয় জাহাজ চলিয়া যাইবেক।

ক্লাইব, এই চাতুরীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, স্থির করিলেন, ওলন্দাজী জাহাজ সকল আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে; অতএব, কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী টানা নামক স্থানে যে গড় ছিল, তাহা দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। ওলন্দাজেরা, দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া, অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, সাত শত ইয়ুরোপীয় ও আট শত মালাই সৈন্য, ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন। ঐ সকল সৈন্য, স্থলপথে, গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া, চুঁচুড়া অভিমুখে চলিল। ক্লাইব, ওলন্দাজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, চুঁচুড়া ও চন্দন নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বেই কর্ণেল ফোর্ড সাহেবকে স্বল্প সৈন্য সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ওলন্দাজী সৈন্য, ক্রমে অগ্রসর হইয়া, চুঁচুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে ছাউনি করিল। কর্ণেল ফোর্ড জানিতেন, উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি আছে। এজন্য, সহসা তাঁহা-

দিগকে আক্রমণ না করিয়া, স্পষ্ট অনুমতির নিমিত্ত, কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন। ক্লাইব তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে ফোর্ড সাহেবের পত্র উপস্থিত হইল। তিনি, খেলা হইতে না উঠিয়াই, পেন্সিল দিয়া এই উত্তর লিখিলেন, ভ্রাতঃ! অবিলম্বে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, কল্য আমি কৌন্সিলের অনুমতি পাঠাইব। ফোর্ড, এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, আক্রমণ করিয়া, আধ ঘণ্টার মধ্যেই, ওলন্দাজদিগকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহাদের যে সকল জাহাজ নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময়ে তৎসমুদায়ও ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হইল। এই রূপে ওলন্দাজদিগের ঐ মহোদ্যোগ পরিশেষে ধূমশেষ হইয়া গেল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পর ক্ষণেই, রাজকুমার মীরন, ছয় সাত সহস্র অশ্বারোহ সৈন্য সহিত, চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। ওলন্দাজেরা জয়ী হইলে, তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে, অনায়াসে ইঙ্গরেজদের সহিত মিলিত হইয়া, ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। কর্ণেল ফোর্ড, যুদ্ধসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই, চুঁচুড়া অবরোধ করিলেন। ঐ নগর ত্বরায় ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইত, কিন্তু ওলন্দাজেরা ক্লাইবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, তিনি উক্ত নগর অধিকার করিলেন না। অনন্তর, তাঁহারা যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় ধরিয়া দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাঁহাদের জাহাজ সকলও ছাড়িয়া দিলেন।

ক্লাইব, ক্রমাগত তিন বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, শারীরিক অত্যন্ত অপটু হইয়াছিলেন। এজন্য, এই সকল

ঘটনার অবসানেই, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারিতে, ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। গবর্ণমেণ্টের ভার বান্সিটার্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইল।

বাঙ্গালা দেশ যে এক বারে নিরুপদ্রব হইবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর নিজ পুত্র মীরনের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিলেন। যুবরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত অত্যন্ত সাহঙ্কার ব্যবহার ও প্রজাগণের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করাতে, সকলেই তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সকলে সিরাজ উদ্দৌলার কুক্রিয়া সকল বিস্মৃত হইয়া গেল।

সম্রাটের পুত্র শাহ আলম, সর্ব্বসাধারণের ঈদৃশ অসন্তোষ দর্শনে সাহসী হইয়া, দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। পূর্ণিয়ার গবর্ণর, কাদিম হোসেন খাঁ, স্বীয় সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। শাহ আলম, কর্ম্মনাশা পার হইয়া, বিহারের সীমায় পদার্পণ মাত্র সংবাদ পাইলেন, সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রসিদ্ধ ক্রূর ইমাদ উল্‌মুলুক সম্রাটের প্রাণ বধ করিয়াছে। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে, শাহ আলম ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন, এবং অযোধ্যার সুবাদারকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বাধিকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি নামমাত্রে সম্রাট হইলেন, তাঁহার পরাক্রমও ছিল না, প্রজাও ছিল না, তৎকালে তাঁহার রাজধানী পর্য্যন্ত বিপক্ষের হস্তগত ছিল, এবং তিনিও নিজে নিজ রাজ্যে এক প্রকার পলায়িত স্বরূপ ছিলেন।

তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলে, পরাক্রান্ত রামনারায়ণ, ঐ নগর রক্ষার এক প্রকার উদ্যোগ করিয়া, সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত, মুরশিদাবাদে পত্র লিখিলেন। কর্ণেল কালিয়ড তৎকালে সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন; এবং মীরনও, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মীরন ইতিপূর্ব্বে দুই জন নিজ কর্ম্মকারকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে দুই ভোগ্যা কামিনীর মস্তক ছেদন করেন। আলিবর্দ্দি খাঁর দুই কন্যা ঘেসিতি বেগম ও আমান বেগম আপন আপন স্বামী নিবাইশ মহম্মদ ও সায়দ অহম্মদের মৃত্যুর পর, গুপ্ত ভাবে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। মীরন, এই যুদ্ধযাত্রা কালে, তাঁহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। ঢাকার গবর্ণর, এই নিষ্ঠুর ব্যাপার সমাধানে অসম্মত হওয়াতে, তিনি আপন এক ভৃত্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাদিগকে, মুরশিদাবাদ আনয়নচ্ছলে নৌকায় আরোহণ করাইয়া, পথের মধ্যে নৌকা সমেত জলমগ্ন করিবে।

এই নিদেশ প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রতিপালিত হইল। হত্যাকারীরা, ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত, নৌকার ছিপী খুলিতে উপক্রম করিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী করুণ স্বরে কহিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমন জগদীশ্বর! আমরা উভয়েই পাপীয়সী ও অপরাধিনী বটে, কিন্তু মীরনের কখনও কোনও অপরাধ করি নাই, প্রত্যুত, আমরাই তাঁহার এই সমুদয় আধিপত্যের মূল।

মীরন, প্রস্থান কালে স্বীয় স্মরণপুস্তকে এই অভিপ্রায়ে

তিন শত ব্যক্তির নাম লিখিয়াছিলেন যে, প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। কিন্তু আর তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল না।

কর্ণেল কালিয়ড রামনারায়ণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাবৎ আমি উপস্থিত না হই, আপনি কোনও ক্রমে সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু তিনি, এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক, সম্রাটের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন। সুতরাং পাটনা নিতান্ত অশরণ হইল। সম্রাট এক উদ্যমেই, ঐ নগর অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু অগ্রে তাহার চেষ্টা না করিয়, দেশলুণ্ঠনেই সকল সময় নষ্ট করিলেন। ঐ সময় মধ্যে, কালিয়ড স্বীয় সমুদয় সৈন্য সহিত উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মীরন, ফেব্রুয়ারির দ্বাবিংশ দিবসের পূর্ব্বে গ্রহ সকল অনুকূল নহেন, এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করাতে, প্রস্তাবিত আক্রমণ স্থগিত রহিল।

২০ এ, সম্রাট, তাঁহাদের উভয়ের সৈন্য এক কালে আক্রমণ করিলেন। মীরনের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ সহসা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু কর্ণেল কালিয়ড়, দৃঢ়তা ও অকুতোভয়তা সহকারে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়া, অবিলম্বে পরাজিত করিলেন। শাহ আলম, সেই রাত্রিতেই, শিবির ভঙ্গ করিয়া, রণক্ষেত্রের পাঁচ ক্রোশ অন্তরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর, তিনি স্বীয় সেনাপতির পরামর্শ অনুসারে, গিরিমার্গ দ্বারা অতর্কিত রূপে গমন

করিয়া, সহসা মুরশিদাবাদ অধিকার করিবার আশয়ে, প্রস্থান করিলেন।

এই প্রয়াণ অতি ত্বরা পূর্ব্বক সম্পাদিত হইল। কিন্তু মীরনও সন্ধান পাইয়া, দ্রুতগতি পোত দ্বারা, আপন পিতার নিকট এই সম্ভাবিত বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অল্প কাল মধ্যেই, সম্রাট, মুরশিদাবাদের পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে, পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু সত্বর আক্রমণ না করিয়া, জনপদ মধ্যে অনর্থক কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে কর্ণেল কালিয়ডও আসিয়া পঁহুছিলেন। উভয় সৈন্য পরস্পর দৃষ্টিগোচর স্থানে শিবির সন্নিবেশন করিল। ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধদানে উদ্যত হইলেন: কিন্তু সম্রাট সহসা অসম্ভব ত্রাসযুক্ত হইয়া, পাটনা প্রতিগমন পূর্ব্বক, ঐ নগর দৃঢ় রূপে অবরোধ করিলেন। ঐ সময়ে, পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খাঁও, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সৈন্য সহিত যাত্রা করিলেন।

সম্রাট, ক্রমাগত নয় দিবস, পাটনা আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ, নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, উক্ত নগর অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইবেক। কিন্তু কাপ্তেন নক্স অত্যল্প সৈন্য সহিত সহসা পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে, সে আশঙ্কা দূর হইল। তিনি কর্ণেল কালিয়ড কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ত্রয়োদশ দিবসে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাত্রিতে, বিপক্ষের শিবির পরীক্ষা করিয়া, পর দিন তাহাদের মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রার সময়, আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের সেনা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। তখন তিনি, আপন শিবিরে অগ্নি দান করিয়া, পলায়ন করিলেন।

দুই এক দিন পরে, কাদিম হোসেন খাঁ, ষোড়শ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হাজীপুরে পঁহুছিয়া, পাটনা আক্রমণের উপক্রম করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন নক্স, সহস্রের অনধিক সৈন্য মাত্র সহিত গঙ্গা পার হইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। এই জয়লাভকে অসাধারণ সাহসের কার্য্য বলিতে হইবেক। এই জয়লাভ দর্শনে, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইঙ্গরেজদিগকে মহাপরাক্রান্ত নিশ্চয় করিলেন। এই যুদ্ধে, রাজা সিতাব রায় এমন অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেন যে, তদ্দর্শনে ইঙ্গরেজেরা, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পর, পূর্ণিয়ার গবর্ণর, সম্রাটের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। কর্ণেল কালিয়ড ও মীরন উভয়ে একত্র হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বর্ষা আরম্ভ হইল, তথাপি তাঁহারা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলেন না। ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই রজনীতে অতিশয় দুর্য্যোগ হইল। মীরন, আপন পটমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, গল্প শুনিতেছিলেন; দৈবাৎ ঐ সময়ে অশনিপাত দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার দুই জন পরিচারকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল। কর্ণেল কালিয়ড, এই দুর্ঘটনা প্রযুক্ত, কাদিম হোসেনের অনুসরণে বিরত হইলেন, এবং পাটনা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বর্ষার অনুরোধে তথায় শিবির সন্নিবেশন করিলেন।

মীরন অত্যন্ত দুরাচার, কিন্তু নিজ পিতার রাজত্বের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন। তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন, নির্ব্বোধ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৃদ্ধ নবাবের যে কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা ছিল, এক্ষণে তাহা এক বারে

লোপ পাইল। অতঃপর রাজকার্য্যে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ, পূর্ব্বতন বেতন নিমিত্ত, রাজভবন অবরোধ করিয়া, বিসংবাদে উদ্যত হইল। তখন, নবাবের জামাতা, মীর কাসিম, তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, স্বধন দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে আপাততঃ ক্ষান্ত করিলেন।

নবাব মীর কাসিমকে, দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। তথায়, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে, তাঁহার বিশেষ রূপে বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তৎকালে, এই দুই সাহেবের মত অনুসারেই, কোম্পানির এতদ্দেশীয় সমুদয় বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ আবশ্যক হওয়াতে, মীর কাসিম পুনর্ব্বার প্রেরিত হয়েন। এই রূপে দুই বার মীর কাসিমের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া, গবর্ণর সাহেবের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, কেবল এই ব্যক্তি অধুনা বাঙ্গালার রাজকার্য্য নির্বাহে সমর্থ। তদনুসারে, তিনি মীর কাসিমকে তিন প্রদেশের ডেপুটী নাজিমী পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মীর কাসিম সম্মত হইলেন। অনন্তর বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস উভয়ে এক দল সৈন্য সহিত মুরশিদাবাদ গমন করিয়া, মীর জাফরের নিকট ঐ প্রস্তাব করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ রূপ হইলে, সমুদয় ক্ষমতা অবিলম্বে জামাতার হস্তে যাইবেক, আমি আপন সভামণ্ডপে পুত্তলিকা প্রায় হইব।

বান্সিটার্ট সাহেব নবাবের অনিচ্ছা দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। মীর কাসিম এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আমি সম্রাটের পক্ষে যাইব। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, এত কাণ্ড করিয়া, কখনই মুরশিদাবাদে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না। তখন, বান্সিটার্ট সাহেব, দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে রাজভবন অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া, মীর জাফর অগত্যা সম্মত হইলেন।

অনন্তর, মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা এ উভয়ের অন্তর স্থানে, বৃদ্ধ নবাবকে এক বাসস্থান দিবার প্রস্তাব হইল। নবাব বিবেচনা করিলেন, যদি আমি মুরশিদাবাদে থাকি, তাহা হইলে যেখানে এত কাল আধিপত্য করিলাম, তথায় সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে হইবেক, এবং নিজ জামাতৃকৃত পরিভব সহ্য করিতে হইবেক। অতএব, আমার কলিকাতা যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি, এক সামান্য নর্ত্তকীকে আপন প্রণয়িনী করিয়াছিলেন, এবং তাহারই আজ্ঞাকারী ছিলেন। ঐ কামিনী উত্তর কালে মণিবেগম নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান পুরাবৃত্তলেখক কহেন, ঐ রমণী ও মীর জাফর, প্রস্থানের পূর্ব্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ পুরঃসর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবদিগের সঞ্চিত মহামূল্য রত্ন সকল হস্তগত করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, ইঙ্গরেজেরা মীর কাসিমকে বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিলেন। তিনি, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুরকে বর্দ্ধমান প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরদিগকে বিংশতি লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন। সেই টাকা তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইলেন।

মীর কাসিম অত্যন্ত বুদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ইঙ্গরেজদিগকে এবং মীর জাফরের ও নিজের সৈন্য ও কর্ম্মচারীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক, প্রথমতঃ তাহার হিসাব প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে সেই সকল পরিশোধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি, সকল বিষয়ে ব্যয় সংকোচ করিয়া আনিলেন; অভিনিবেশ পূর্ব্বক সমুদয় হিসাব দেখিতে লাগিলেন; এবং মীর জাফরের শিথিল শাসন কালে, রাজপুরুষেরা সুযোগ পাইয়া যত টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন, অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সকল টাকা আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি জমীদারদিগের নিকট হইতে কেবল বাকী আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সমুদয় জমীদারীর নূতন বন্দোবস্তও করিলেন। তাঁহার অধিকারের পূর্ব্বে, দুই প্রদেশের রাজস্ব বার্ষিক ১৪২৪৫০০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, তিনি বৃদ্ধি করিয়া ২৫৬২৪০০০ টাকা

করিলেন। এই সকল উপায় দ্বারা তাঁহার ধনাগার অনতি-বিলম্বে পরিপূর্ণ হইল। তখন, তিনি সমস্ত পূর্ব্বতন দেয় পরিশোধ করিলেন; এবং নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়াতে, তদীয় সৈন্য সকল বিলক্ষণ বশীভূত রহিল।

ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করেন; কিন্তু, ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে আপনাকে মুক্ত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও আমি সর্ব্বসম্মত নবাব বটে, বাস্তবিক সমুদয় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ইঙ্গরেজদিগের হস্তেই রহিয়াছে। আর, তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে কখনই ইঙ্গরেজদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না; অতএব স্বীয় সৈন্যের শুদ্ধি ও বৃদ্ধি বিষয়ে তৎপর হইলেন। যে সকল সৈন্য অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; সৈন্যদিগকে ইঙ্গরেজী রীতি অনুসারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং এক আরমানিকে সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

এই ব্যক্তি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম গর্গিন খাঁ। ইনি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। গর্গিন প্রথমতঃ এক জন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য থাকাতে, মীর কাসিম তাঁহাকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও, সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে, স্বীয় স্বামীকে ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং গোলন্দাজদিগকে

শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য সকল এমন উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালাতে কখনও কোনও রাজার সেরূপ ছিল না।

মীর কাসিম, ইঙ্গরেজদিগের অগোচরে আপন অভি-প্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার আরমানি সেনাপতি বন্দুক ও কামানের কারখানা স্থাপন করিলেন। বন্দুকের নির্মাণকৌশলের নিমিত্ত ঐ নগরের অদ্যাপি যে প্রতিষ্ঠা আছে, গর্গিন খাঁ তাহার আদিকারণ। তৎকালে গর্গিনের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক ছিল না।

সম্রাট শাহ আলম তৎকাল পর্য্যন্ত বিহারের পর্যান্ত-দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতএব, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের বর্ষা শেষ হইবা মাত্র, মেজর কার্ণাক, সৈন্য সহিত যাত্রা করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধের পর, কার্ণাক সাহেব সন্ধি প্রস্তাব করিয়া রাজা সিতাব রায়কে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলে, ইংলণ্ডীয় সেনাপতি, তদীয় শিবিরে গমন পূর্ব্বক. তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন।

মীর কাসিম, সম্রাটের সহিত ইংরেজদিগের সান্ধিবার্ত্তা শ্রবণে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং আপনার পক্ষে কোনও অপকার না ঘটে, এই নিমিত্ত সত্বর পাটনা গমন করিলেন। মেজর কার্ণাক মীর কাসিমকে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোনও ক্রমে সম্রাটের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে, এই নির্দ্ধারিত

হইল, উভয়েই ইঙ্গরেজদিগের কুঠীতে আসিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিবেন।

উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এক সিংহাসন প্রস্তুত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট তদুপরি উপবেশন করিলেন। মীর কাসিম, সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলে, তিনি প্রতি-বৎসর চতুর্বিংশতি লক্ষ টাকা করদান স্বীকার করিলেন। তৎপরে, সম্রাট দিল্লী যাত্রা করিলেন। কার্ণাক সাহেব কর্ম্মনাশার তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। সম্রাট, কার্ণাকের নিকট বিদায় লইবার সময়, প্রস্তাব করিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই আমি তাঁহা-দিগকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করিব। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে, উড়িষ্যার অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদত্ত হয়, সুবর্ণরেখার উত্তর-বর্ত্তী অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তদবধি ঐ অংশই উড়িষ্যা নামে উল্লিখিত হইত।

মীর কাসিম, পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণ ব্যতিরিক্ত, সমুদয় জমীদারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে আপন বশে আনিয়া-ছিলেন। রামনারায়ণের ধনবান বলিয়া খ্যাতি ছিল, কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়চ্ছায়াতে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। অতএব, সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া নবাব কৌশলক্রমে তাঁহার সর্ব্বনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ তিন বৎসর হিসাব পরিষ্কার করেন নাই। নবাব ইঙ্গরেজদিগকে লিখিলেন,

রামনারায়ণের নিকট বাকী আদায় না হইলে, আমি আপনাদের দেয় পরিশোধ করিতে পারিব না, আর, যাবৎ আপনাদের সৈন্য পাটনাতে থাকিবেক, তাবৎ ঐ বাকী আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই।

তৎকালে কলিকাতার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল, এক পক্ষ মীর কাসিমের অনুকূল, অন্য পক্ষ তাঁহার প্রতিকূল; গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব অনুকূল পক্ষে ছিলেন। মীর কাসিমের প্রস্তাব লইয়া উভয় পক্ষের বিস্তর বাদানুবাদ হইল। অবশেষে বান্সিটার্টের পক্ষই প্রবল হইল। এই পক্ষের মত অনুসারে ইঙ্গরেজেরা পাটনা হইতে আপনাদের সৈন্য উঠাইয়া আনিলেন, সুতরাং রামনারায়ণ নিতান্ত অসহায় হইলেন, এবং নবাবও তাঁহাকে রুদ্ধ ও কারাবদ্ধ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

মীর কাসিম এ পর্য্যন্ত, নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করিলেন। পরে তিনি কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের আত্মম্ভরিতা দোষে যে রূপে রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের যে সকল পণ্য দ্রব্য এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে নীত হইত, তাহার শুল্ক হইতেই অধিকাংশ রাজস্ব উৎপন্ন হইত। এই রূপে রাজস্ব গ্রহণ করা এক প্রকার অসভ্যতার প্রথা বলিতে হইবেক; কারণ, উহাতে বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু এই কালে ইহা

অত্যন্ত প্রচলিত ছিল; এবং ইঙ্গরেজেরাও, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে, ইহা রহিত করেন নাই। যখন কোম্পানি বাহাদুর, সালিয়ানা তিন হাজার টাকার পেস্কস দিয়া, বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তদবধি তাঁহাদের পণ্য দ্রব্যের মাশুল লাগিত না। কলিকাতার গবর্ণর এক দস্তক স্বাক্ষর করিতেন, মাশুলঘাটায় তাহা দেখাইলেই, কোম্পানির বস্তু সকল বিনা মাশুলে চলিয়া যাইত।

এই অধিকার কেবল কোম্পানির নিজের বাণিজ্য বিষয়ে ছিল। কিন্তু যখন ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন কোম্পানির যাবতীয় কর্ম্মকারকেরা নিজ নিজ বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। যত দিন ক্লাইব এ দেশে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই, দেশীয় বণিকদের ন্যায়, রীতিমত শুল্ক প্রদান করিতেন। পরে যখন তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং কৌন্সিলের সাহেবরা অন্য এক নবাবকে সিংহাসনে বসাইলেন, তখন তাঁহারা, আরও প্রবল হইয়া, বিনা শুল্কেই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহারা এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার বাধা দিতে নবাবের কর্ম্মকারকদিগের সাহস হইত না।

ইঙ্গরেজদের গোমস্তারা শুল্ক বঞ্চন করিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা অনুসারে ইঙ্গরেজী নিশান তুলিত, এবং দেশীয় বণিক ও রাজকীয় কর্ম্মকারকদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিত। ব্যক্তি মাত্রেই, যে কোনও ইঙ্গরেজের স্বাক্ষরিত দস্তক হস্তে করিয়া, আপনাকে কোম্পানি বাহাদুরের তুল্য বোধ করিত। নবাবের লোকেরা কোনও বিষয়ে আপত্তি করিলে,

ইয়ুরোপীয় মহাশয়েরা, সিপাই পাঠাইয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতেন ও কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শুল্ক না দিয়া কোনও স্থানে কিছু দ্রব্য লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে, নাবিকেরা নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিত।

ফলতঃ, এই রূপে নবাবের পরাক্রম এক বারে বিলুপ্ত হইল। দেশীয় বণিকদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজ মহাত্মারা বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। নবাবের রাজস্ব অত্যন্ত ন্যূন হইল; কারণ, ইঙ্গরেজেরাই কেবল শুল্ক দিতেন না এমন নহে; যাহারা তাঁহাদের চাকর বলিয়া পরিচয় দিত, তাহারাও, তাঁহাদের নাম করিয়া, মাশুল ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল। মীর কাসিম এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, কলিকাতার কৌন্সিলে অনেক বার অভিযোগ করিলেন। পরিশেষে, তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আপনারা ইহার নিবারণ না করিলে, আমি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিব।

বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব এই সকল অন্যায় নিবারণের অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, ঐ সকল অবৈধ উপায় দ্বারা উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইল। পরিশেষে, ঐ সকল অবৈধ ব্যবহারের এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল যে, কোম্পানির গোমস্তাদিগের নির্দ্ধারিত মূল্যেই দেশীয় বণিকদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইত। অতঃপর, মীর কাসিম ইঙ্গরেজদিগকে শত্রু মধ্যে গণনা করিলেন; এবং ত্বরায় উভয় পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।

ইহার নিবারণার্থে, বান্সিটার্ট সাহেব স্বয়ং মুঙ্গেরে গিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নবাবও সৌহৃদ্য ভাবে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে, বিষয়কর্ম্মের কথা উত্থাপিত হইলে, মীর কাসিম, কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের অত্যাচার বিষয়ে যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অনেক অনুযোগ করিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, প্রস্তাব করিলেন, কি দেশীয় লোক, কি ইঙ্গরেজ, সকলকেই বস্তুমাত্রের একবিধ মাশুল দিতে হইবেক; কিন্তু আমার স্বয়ং এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব কলিকাতায় গিয়া, কৌন্সিলের সাহেবদিগকে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতে পরামর্শ দিব। নবাব, অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু কহিলেন, যদি ইহাতেও এই অনিয়মের নিবারণ না হয়, আমি মাশুলের প্রথা এক বারে রহিত করিয়া, কি দেশীয়, কি ইয়ুরোপীয়, উভয়বিধ বণিকদিগকে সমান করিব।

বান্সিটার্ট সাহেব, কৌন্সিলে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, সত্বর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মীর কাসিম, কৌন্সিলের মতামত পরিজ্ঞান পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, শুল্কসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকদিগের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন, তোমরা ইঙ্গরেজদের নিকট হইতেও শতকরা নয় টাকার হিসাবে মাশুল আদায় করিবে। ইঙ্গরেজেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইলেন এবং নবাবের কর্ম্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। মফঃসলের কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবেরা কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর

কলিকাতায় আগমন করিলেন। শতকরা নয় টাকা শুল্কের বিষয়ে বান্সিটার্ট সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন, হেষ্টিংস ভিন্ন অন্য সকলেই, অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিলেন, কেবল লবণের উপর আমরা শতকরা আড়াই টাকা মাত্র শুল্ক দিব।

মীর কাসিম তৎকালে বাঙ্গালায় ছিলেন না, যুদ্ধযাত্রায় নেপাল গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রবণ করিলেন, কৌন্সিলের সাহেবেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কর্ম্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তিনি, কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী কার্য্য করিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের শুল্ক এক বারে উঠাইয়া দিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরেরা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, নবাবকে, আপন প্রজাদিগের নিকট পূর্ব্বমত শুল্ক লইতে হইবেক এবং ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে হইবেক। এ বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। হেষ্টিংস সাহেব কহিলেন, মীর কাসিম অধীশ্বর রাজা, নিজ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান কেন না করিবেন। ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষ বাট্‌সন সাহেব কহিলেন, এ কথা নবাবের গোমস্তারা কহিলে সাজে, কৌন্সিলের মেম্বরের উপযুক্ত নহে। হেষ্টিংস কহিলেন, পাজী না হইলে, এরূপ কথা মুখে আনে না।

এই রূপ রোষবশ হইয়া কৌন্সিলের মেম্বরেরা এবংবিধ গুরুতর বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে

এই নির্দ্ধারিত হইল, দেশীয় লোকের বাণিজ্যেই পূর্ব্ব নিরূপিত শুল্ক থাকে, এই বিষয়ে উপরোধ করিবার নিমিত্ত, আমিয়ট ও হে সাহেব মীর কাসিমের নিকট গমন করুন। তাঁহারা, তথায় পঁহুছিয়া, নবাবের সহিত কয়েক বার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, সকল বিষয়েরই নির্ব্বিবাদে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। কিন্তু পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের উদ্ধত আচরণ দ্বারা মীমাংসার আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইল। কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মকারকের মধ্যে এলিস অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। নবাব আমিয়ট সাহেবকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তাঁহার যে সকল কর্ম্মকারক কলিকাতায় কয়েদ ছিল, হে সাহেবকে তাহাদের প্রতিভূ স্বরূপ আটক করিয়া রাখিলেন। আমিয়ট সাহেব নবাবের হস্তবহির্ভূত হইয়াছেন বোধ করিয়া, এলিস সাহেব অকস্মাৎ পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সকল সুরাপানে মত্ত ও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়াতে, নবাবের এক দল বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পুনর্ব্বার নগর অধিকার করিল; এলিস ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়েরা রুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

মীর কাসিম পাটনার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বোধ করিলেন, এক্ষণে নিঃসন্দেহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবেক। অতএব, তিনি সমস্ত মফঃসল কুঠীর কর্ম্মকারক সাহেব দিগকে রুদ্ধ করিতে ও আমিয়ট সাহেবের কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমিয়ট সাহেব মুরশিদাবাদে পঁহুছিয়াছেন, এমন সময়ে নগরাধ্যক্ষের নিকট ঐ আদেশ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ঐ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সাহেব উক্ত আদেশ অমান্য করাতে, দাঙ্গা উপস্থিত হইল; ঐ দাঙ্গাতে তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। মীর কাসিম, শেঠবংশীয় প্রধান বণিকদিগকে ইঙ্গরেজের অনুগত বলিয়া সন্দেহ করিতেন; এজন্য, তাহাদিগকে মুরশিদাবাদ হইতে আনাইয়া মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আমিয়ট সাহেবের মৃত্যু এবং এলিস সাহেব ও তদীয় সহচরবর্গের কারাবরোধের সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, কৌন্সিলের সাহেবেরা অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা নির্দ্ধারিত করিলেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন যে, মীর কাসিম পাটনায় যে কয়েক জন সাহেবকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যাবৎ উদ্ধার না হয়, অন্ততঃ তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকা উচিত, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। অধিকাংশ মেম্বরের সম্মতি ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সেই সময়ে, মীর জাফর স্বীকার করিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা পুনর্ব্বার আমাকে নবাব করেন, আমি কেবল দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব্ব শুল্ক প্রচলিত রাখিব, ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে দিব। অতএব, কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেই পুনর্ব্বার সিংহাসনে নিবিষ্ট করা মনস্থ করিলেন। বায়াত্তরিয়া বৃদ্ধ মীর জাফর তৎকালে কুষ্ঠরোগে প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইয়াছিলেন, তথাপি মুরশিদাবাদগামী ইংলণ্ডীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, পুনর্ব্বার নবাব হইতে চলিলেন।

মীর কাসিম, স্বীয় সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা

দেশে কখনও কোনও রাজার তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল না; তাঁহার সেনাপতি গর্গিন খাঁও যুদ্ধবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তথাপি, উপস্থিত যুদ্ধ অল্প দিনেই শেষ হইল। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ১৯এ জুলাই, কাটোয়াতে নবাবের সৈন্য সকল পরাজিত হইল। মতিঝিলে নবাবের যে সৈন্য ছিল, ইঙ্গরেজেরা, ২৪এ, তাহা পরাজয় করিয়া, মুরশিদাবাদ অধিকার করিলেন। সূতির সন্নিহিত ঘেরিয়া নামক স্থানে, ২রা আগষ্ট, আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতেও মীর কাসিমের সৈন্য পরাজিত হইল। রাজমহলের নিকট উদয়নালাতে তাঁহার এক দৃঢ় গড়খাই করা ছিল, নবাবের সৈন্য সকল পলাইয়া তথায় আশ্রয় লইল।

এই সকল যুদ্ধকালে মীর কাসিম মুঙ্গেরে ছিলেন; এক্ষণে উদয়নালার সৈন্য মধ্যে উপস্থিত থাকিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান লোকদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করিলেন। তিনি পাটনার পূর্ব্ব গবর্ণর রাজা রামনারায়ণকে, গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া নদী মধ্যে নিক্ষিপ্ত করাইলেন, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমুদয় পুত্র সহিত রাজা রাজবল্লভ, রায়রাইয়াঁ রাজা উমেদ সিংহ, রাজা বনিয়াদ সিংহ, রাজা ফতে সিংহ ইত্যাদি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলেন, এবং শেঠবংশীয় দুই জন ধনবান বণিককে মুঙ্গেরের গড়ের বুরুজ হইতে নদীতে নিক্ষিপ্ত করাইলেন। বহু কাল পর্য্যন্ত, নাবিকেরা, ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত কালে, উক্ত হতভাগ্য দ্বয়ের বধস্থান দেখাইয়া দিত।

মীর কাসিম, এই হত্যাকাণ্ড সমাপন করিয়া, উদয়-নালাস্থিত সৈন্য সহিত মিলিত হইলেন। অক্টোবরের আরম্ভে, ইঙ্গরেজেরা নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিলেন। পরাজয়ের দুই এক দিবস পরে তিনি মুঙ্গেরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের যে সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহা নিবারণ করা অসাধ্য বোধ করিয়া, সৈন্য সহিত পাটনা পলায়ন করিলেন। যে কয়েক জন ইঙ্গরেজ তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

মুঙ্গের পরিত্যাগের পর দিন তাঁহার সৈন্য রেবাতীরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে তাঁহার শিবির মধ্যে হঠাৎ অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকল লোকই নদী পার হইয়া পলাইতে উদ্যত। দৃষ্ট হইল, কয়েক ব্যক্তি এক শব লইয়া গোর দিতে যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ গর্গিন খাঁর কলেবর। বিকালে, তিন চারি জন মোগল, তদীয় পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণ-বধ করে। তৎকালে উল্লিখিত ঘটনার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারা সেনাপতির নিকট বেতন প্রার্থনা করিতে যায়; তিনি তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়াতে, তাহারা তরবারি বহিষ্কৃত করিয়া, তাঁহাকে বধ করে। কিন্তু, সে সময়ে তাহাদের কিছুই পাওনা ছিল না। নয় দিবস পূর্ব্বে তাহারা বেতন পাইয়াছিল।

বস্তুতঃ ইহা এক অলীক কল্পনা মাত্র। এই অশুভ ঘটনার প্রকৃত কারণ এই যে, মীর কাসিম স্বীয় সেনাপতি গর্গিন খাঁর প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত, ছল পূর্ব্বক তাহা-

দিগকে পাঠাইয়া দেন। গর্গিনের খোজা পিক্রস নামে এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় ছিল। পিক্রস এই অনুরোধ করিয়া গোপনে গর্গিনকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তুমি নবাবের কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আর যদি সুযোগ পাও, তাঁহাকে রুদ্ধ করিবে। নবাবের প্রধান চর, এই বিষয়ের সন্ধান পাইয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়ে, আপন প্রভুকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয় যে, আপনকার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক; তৎপরে, এক দিবস অতীত না হইতেই, আরমানি সেনাপতি গর্গিন খাঁ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নবাবের সৈন্য সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইয়াও, প্রতিযুদ্ধেই যে, ইঙ্গরেজদিগের নিকট পরাজিত হয়, গর্গিন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার এক মাত্র কারণ।

তদনন্তর, মীর কাসিম সত্বর পাটনা পলায়ন করিলেন। মুঙ্গের ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। তখন নবাব বিবেচনা করিলেন, পাটনাও পরিত্যাগ করিতে হইবেক এবং পরিশেষে দেশত্যাগীও হইতে হইবেক। ইঙ্গরেজদের উপর তাঁহার ক্রোধের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে, সমস্ত ইঙ্গরেজ বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড নিশ্চয় করিয়া, আপন সেনাপতিদিগকে বন্দীগৃহে গিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা ঘাতক নহি যে, বিনা যুদ্ধে প্রাণবধ করিব। তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদান করুন, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা এই রূপে অস্বীকার করাতে নবাব,

শমরু নামক এক ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের প্রাণ-বধের আদেশ দিলেন।

শমরু পূর্ব্বে ফরাসিদিগের এক জন সার্জ্জন ছিল, পরে মীর কাসিমের নিকট নিযুক্ত হয়। সে এই জুগুপ্সিত ব্যাপার সমাধানের ভার গ্রহণ করিল, এবং কিয়ৎ সংখ্যক সৈনিক সহিত কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গুলি করিয়া ডাক্তর ফুলর্টন ব্যতিরিক্ত সকলেরই প্রাণবধ করিল। আটচল্লিশ জন ভদ্র ইঙ্গরেজ ও এক শত পঞ্চাশ জন গোরা এই রূপে পাটনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শমরু তৎপরে অনেক রাজার নিকট কর্ম্ম করে; পরিশেষে সিরধানার আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। এই হত্যায় সে সকল লোক হত হয়, তন্মধ্যে কৌন্সিলের মেম্বর এলিস, হে, লসিংটন এই তিন জনও ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ই নবেম্বর, পাটনা নগর ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল; মীর কাসিম পলাইয়া অযোধ্যার সুবাদারের আশ্রয় হইলেন।

এই রূপে প্রায় চারি মাসে যুদ্ধের শেষ হইল। পর বৎসর, ২২এ অক্টোবর, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি বক্সারে অযোধ্যার সুবাদারের সৈন্য সকল পরাজয় করিলেন। জয়ের পর উজীরের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই; এজন্য এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া, ইহা কহিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক যে, তিনি প্রথমতঃ মীর কাসিমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া তাড়াইয়া দেন।

মীর জাফর দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ়

হইয়া দেখিলেন, ইঙ্গরেজদিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা পরিশোধ করা অসাধ্য। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, চতুঃসপ্ততি বৎসর বয়সে, মুরশিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা দিল্লীর সম্রাটের অধিকার। কিন্তু তৎকালে সম্রাটের কোনও ক্ষমতা ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই তাঁহারা করিলেন। মণিবেগমের গর্ভজাত নজম উদ্দৌলা নামে মীর জাফরের এক পুত্র ছিল; কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা, অনেক টাকা পাইয়া, তাঁহাকেই নবাব করিলেন। তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইল। ইঙ্গরেজেরা দেশরক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইলেন, এবং নবাবকে, রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত, একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিতে কহিলেন।

নবাব অনুরোধ করিলেন, নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু কৌন্সিলের সাহেবেরা তাহা স্পষ্ট রূপে অস্বীকার করিলেন। অধিকন্তু, বান্সিটার্ট সাহেব, ভাবী গবর্ণরদিগকে সাবধান করিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারের কুক্রিয়া সকল কৌন্সিলের বহিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর কুটুম্ব মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের কুব্যবাহার নিমিত্ত যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং মীর কাসিম ও উজীরের সহিত যে যুদ্ধ ও পাটনায় যে হত্যা হয়, এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া, ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা এই ভয় করিতে লাগিলেন, পাছে এই নবোপার্জ্জিত রাজ্য হস্তবহির্ভূত হয়; এবং ইহাও বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রম প্রভাবে রাজ্যাধিকার লব্ধ হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি এক্ষণে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব, তাঁহারা ক্লাইবকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা তাঁহার সমুচিত পুরস্কার করেন নাই, বরং তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তথাপি তিনি, তাঁহাদের অনুরোধে, পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে, কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, বাঙ্গালার গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন; কহিয়া দিলেন, ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য দ্বারাই এত অনর্থ ঘটিতেছে; অতএব তাহা অবশ্য রহিত করিতে হইবেক। আট বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা, উপর্য্যুপরি কয়েক নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়া, দুই কোটির অধিক টাকা উপঢৌকন লইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহারা

স্থির করিয়া দিলেন, সেরূপ উপঢৌকন রহিত করিতে হইবেক। তাঁহারা আরও আজ্ঞা করিলেন, কি রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত কি সেনা সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে এক এক নিয়মপত্রে স্বাক্ষর ও এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক, চারি হাজার টাকার অধিক উপঢৌকন পাইলে, সরকারী ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবেন, এবং গবর্ণরের অনুমতি ব্যতিরেকে, হাজার টাকার অধিক উপহার লইবেন না।

এই সকল উপদেশ দিয়া, ডিরেক্টরেরা ক্লাইবকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। তিনি, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৩রা মে, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, ডিরেক্টরেরা যে সকল আপদ আশঙ্কা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কৌন্সিলের মেম্বরেরাও কোম্পানির মঙ্গল চেষ্টা করেন না। সমুদয় কর্ম্মচারীর এই অভিপ্রায়, যে কোনও উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া, ত্বরায় ইংলণ্ড প্রতিগমন করিবেন। সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপ অবিচার। আর, এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপর এত অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, ইঙ্গরেজ এই শব্দ শুনিলে, তাঁহাদের মনে ঘৃণার উদয় হইত। ফলতঃ, তৎকালে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও ভদ্রতার লেশ মাত্র ছিল না।

পূর্ব্ব বৎসর ডিরেক্টরেরা দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা আর কোনও রূপে উপঢৌকন লইতে পারিবেন না; এই আজ্ঞা উপস্থিত হইবার সময়, বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কৌন্সিলের

মেম্বরেরা উক্ত আজ্ঞা কৌন্সিলের পুস্তকে নিবিষ্ট করেন নাই; বরং মীর জাফরের মৃত্যুর পর, এক ব্যক্তিকে নবাব করিয়া, তাঁহার নিকট অনেক উপহার গ্রহণ করেন; সেই পত্রে ডিরেক্টরেরা ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে নিজ নিজ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবেক। কিন্তু এই স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, কৌন্সিলের সাহেবেরা নূতন নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করেন, ইঙ্গরেজেরা পূর্ব্ববৎ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পাইবেন।

ক্লাইব, উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই, ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা সকল প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা, বান্সিটার্ট সাহেবের সহিত যেরূপ বিবাদ করিতেন, তাঁহারও সহিত সেই রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব অন্যবিধ পদার্থে নির্ম্মিত। তিনি জিদ করিতে লাগিলেন, সকল ব্যক্তিকেই, আর উপঢৌকন লইব না বলিয়া, নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবেক। যাঁহারা অস্বীকার করিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন। তদ্দর্শনে কেহ কেহ স্বাক্ষর করিলেন। আর, যাঁহারা, অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সকলেই নির্বিশেষে তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিলেন।

সমুদয় রাজস্ব যুদ্ধব্যয়েই পর্য্যবসিত হইতেছে, অতএব সন্ধি করা অতি আবশ্যক, এই বিবেচনা করিয়া, ক্লাইব, জুন মাসের চতুর্বিংশ দিবসে পশ্চিম অঞ্চল যাত্রা করিলেন। নজম উদ্দৌলার সহিত এই রূপ সন্ধি হইল যে, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন, তিনি, আপন বীয়

নির্ব্বাহের নিমিত্ত, প্রতিবৎসর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবেন, মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভ রাম ও জগৎ শেঠ, এই তিন জনের মত অনুসারে ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবেক। কিছু দিন পরে, অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল।

এই যাত্রায় যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে কোম্পানির নামে তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্রাট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানী দিবেন; ক্লাইব, এলাহাবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞা পরিপূরণের প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। ১২ই আগষ্ট, সম্রাট কোম্পানি বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন; আর, ক্লাইব স্বীকার করিলেন, উৎপন্ন রাজস্ব হইতে সম্রাটকে প্রতিমাসে দুই লক্ষ টাকা দিবেন।

সম্রাট তৎকালে আপন রাজ্যে পলায়িত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার রাজকীয় পরিচ্ছদ আদি ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের খানা খাইবার দুই মেজ একত্রিত ও কার্ম্মিক বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া, সিংহাসন প্রস্তুত করা গেল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট, তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া, বার্ষিক দুই কোটি টাকার রাজস্ব সহিত তিন কোটি প্রজা ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে এরূপ গুরুতর ব্যাপার নির্ব্বাহ বিষয়ে, কত অভিজ্ঞ মন্ত্রী ও কার্য্যদক্ষ দূত প্রেরণ এবং কত

বাদানুবাদের আবশ্যকতা হইত; কিন্তু, এক্ষণে ইহা এত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে, একটা গর্দ্দভ বিক্রয়ও ঐ সময় মধ্যে সম্পন্ন হইয়া উঠে না।

পলাশির যুদ্ধের পর, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে যে সকল হিতজনক ব্যাপার ঘটে, এই বিষয় সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। ইঙ্গরেজেরা ঐ যুদ্ধ দ্বারা বাস্তবিক এ দেশের প্রভু হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সেরূপ গণনা করিতেন না; এক্ষণে, সম্রাটের এই দান দ্বারা, তিন প্রদেশের যথার্থ অধিকারী বোধ করিলেন। তদবধি, মুরশিদাবাদের নবাব সাক্ষিগোপাল হইলেন। ক্লাইব, এই সকল ব্যাপার সমাধান করিয়া, ৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন।

কোম্পানির কর্ম্মচারীরা যে নিজ নিজ বাণিজ্য করিতেন, তদুপলক্ষেই অশেষবিধ অত্যাচার ঘটিত। এজন্য ডিরেক্টরেরা বারম্বার এই আদেশ করেন যে, উহা এক বারে রহিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা, ঐ সকল আদেশ এ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তিম আদেশ কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ছিল, এবং ক্লাইবও বিবেচনা করিলেন যে, সিবিল কর্ম্মচারীদিগের বেতন অত্যন্ত অল্প; সুতরাং তাহারা অবশ্য গর্হিত উপায় দ্বারা পোষাইয়া লইবেক। এজন্য, তিনি তাহাদের বাণিজ্য, এক বারে রহিত না করিয়া, ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার মনন করিলেন।

এই স্থির করিয়া, ক্লাইব লবণ, গুবাক, তবাক, এই তিন বস্তুর বাণিজ্য ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার নিমিত্ত, এক সভা

স্থাপন করিলেন। নিয়ম হইল, কোম্পানির ধনাগারে শতকরা ৩৫ টাকার হিসাবে মাশুল জমা করা যাইবেক, এবং যে উপস্বত্ব হইবেক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ও সেনা-সম্পর্কীয় সমুদয় কর্ম্মচারীরা যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইবেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা অধিক অংশ পাইবেন, তাঁহাদের নীচের কর্ম্মচারীরা অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন।

ডিরেক্টরদিগের নিকট এই বাণিজ্যপ্রণালীর সংবাদ পাঠাইবার সময়, ক্লাইব তাঁহাদিগকে গবর্ণরের বেতন বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ, তাহা হইলে, তাঁহার এই বাণিজ্য বিষয়ে কোনও সংস্রব রাখিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না। কিন্তু তাঁহারা, তৎপরে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত, এই সৎ পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা, উক্ত নূতন সভা স্থাপনের সংবাদ শ্রবণ মাত্র, অতি রূঢ় বাক্যে তাহা অস্বীকার করিলেন; ক্লাইব এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার যথোচিত তিরস্কার লিখিলেন, এবং এই আদেশ পাঠাইলেন, উক্ত সভা রহিত করিতে হইবেক ও কোনও সরকারী কর্ম্মচারী বাঙ্গালার বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

এ কাল পর্য্যন্ত, সমুদয় রাজস্ব কেবল রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয়ে পর্য্যবসিত হইতেছিল। কোম্পানির শুনিতে অনেক আয় ছিল বটে; কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। কি ইয়ুরোপীয়, কি এতদ্দেশীয়, সমুদয় কর্ম্মচারীরা কেবল লুঠ করিত, কিছুই দয়া ভাবিত না। ইংলণ্ডে ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; কোম্পানির এরূপ আয় থাকিতেও চির কাল এত অপ্রতুল কেন। তাহাতে

তিনি এই উত্তর দেন, কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানি বাহাদুরের নামে এক বার বিল করিতে দিলেই, সে বিষয় করিয়া লয়।

কিন্তু ব্যয়ের প্রধান কারণ সৈন্য। সৈন্য সকল যাবৎ নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিত, তিনি তত দিন তাহাদিগকে ভাতা দিতেন। এই ভাতাকে ডবলবাটা কহা যাইত। এই পারিতোষিক তাহারা এত অধিক দিন পাইয়া আসিয়াছিল যে, পরিশেষে তাহা আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বোধ করিত। ক্লাইব দেখিলেন, সৈন্যের ব্যয় লাঘব করিতে না পারিলে, কখনই রাজস্ব বাঁচিতে পারে না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, ব্যয় লাঘবের যে কোনও প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহাতেই আপত্তি উত্থাপিত হইবেক। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; অতএব এক বারেই এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, অদ্যাবধি ডবলবাটা রহিত হইল।

এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, সেনাসম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমাদের অস্ত্রবলে দেশ জয় হইয়াছে; অতএব ঐ জয় দ্বারা আমাদের উপকার হওয়া সর্ব্বাগ্রে উচিত। কিন্তু ক্লাইবের মন বিচলিত হইবার নহে। তিনি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু ইহাও স্থির করিয়াছিলেন, সৈন্যের ব্যয় লাঘব করা অত্যন্ত আবশ্যক। সেনাপতিরা, ক্লাইবকে আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত, চক্রান্ত করিলেন। তাঁহারা পরস্পর গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, সকলেই এক দিনে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

তদনুসারে, প্রথম ব্রিগেডের সেনাপতিরা সর্ব্বাগ্রে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ক্লাইব এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত

ব্যাকুল হইলেন; এবং সন্দেহ করিতে লাগিলেন, হয় ত, সমুদয় সৈন্য মধ্যে এইরূপ চক্রান্ত হইযাছে। তিনি অনেক বার অনেক আপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এমন দায়ে কখনও ঠেকেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন, এ দিকে ইঙ্গরেজদিগের সেনা অধ্যক্ষহীনা হইল। কিন্তু ক্লাইব, এরূপ সঙ্কটেও চলচিত্ত না হইয়া, আপন স্বভাবসিদ্ধ সাহস সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি মান্দ্রাজ হইতে সেনাপতি আনয়নের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বাঙ্গালার যে যে সেনাপতি স্পষ্ট বিদ্রোহী হয়েন নাই, তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। ক্লাইব, প্রধান প্রধান বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ইংলণ্ড পাঠাইয়া দিলেন। এবংবিধ কাঠিন্য প্রয়োগ দ্বারা, তিনি পুনর্ব্বার সৈন্যদিগকে বশীভূত করিয়া আনিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টকেও এই অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর আপদ হইতে মুক্ত করিলেন।

ক্লাইব, ভারতবর্ষে আসিয়া, বিংশতি মাসে কোম্পানির কার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন ও ব্যয়ের লাঘব করিলেন, তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া, প্রায় দুই কোটি টাকা বার্ষিক আয় স্থিত করিলেন, এবং সৈন্য মধ্যে যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার শান্তি করিয়া, বিলক্ষণ সুরীতি স্থাপন করিলেন। তিনি এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক এরূপ ক্লিষ্ট হইলেন যে, স্বদেশে প্রস্থান না করিলে আর চলে না। অতএব, ১৭৭৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ইঙ্গরেজেরা তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা এ পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যাপারেই ব্যাপৃত ছিলেন; ভূমির কর সংগ্রহ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবাদারেরা, হিন্দুদিগকে অত্যন্ত সহিষ্ণুস্বভাব ও হিসাবে নিপুণ দেখিয়া, এই সকল বিষয়ের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতেন। ইঙ্গরেজেরা এ দেশের তাবৎ বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তাহাদিগকেও সমস্ত ব্যাপারই পূর্ব্ব রীতি অনুসারে প্রচলিত রাখিতে হইল। রাজা সিতাব রায়, বিহারের দেওয়ানের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, পাটনায় অবস্থিতি করিলেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া, মুরশিদাবাদে রহিলেন। প্রায় সাত বৎসর এই রূপে রাজ্যশাসন হয়। পরে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন।

এই কয়েক বৎসর, রাজ্যশাসনের কোনও প্রণালী বা শৃঙ্খলা ছিল না। জমীদার ও প্রজাবর্গ, কাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিবেক, তাহার কিছুই জানিত না। সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার নবাব ও তদীয় অমাত্যবর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা এ দেশের সর্ব্বত্র এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও, রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন না। আর, পার্লিমেণ্টের বিধান অনুসারে, কলিকাতার গবর্ণর সাহেবেরও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, মহারাষ্ট্র-খাতের বহির্ভাগে কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধ করিলে,

তাহার দণ্ড বিধান করিতে পারেন। ফলতঃ, ইঙ্গরেজদিগের দেওয়ানী প্রাপ্তির পর সাত বৎসর সমস্ত দেশে এত ক্লেশ ও এত গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই রূপে কয়েক বৎসর রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে, ডাকাইতীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সকল জিলাই ডাকাইতের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাতে কোনও ধনবান ব্যক্তি নিরাপদে ছিলেন না। ফলতঃ, ডাকাইতীর এত বাড়াবাড়ী হইয়াছিল যে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে যখন কোম্পানি বাহাদুর আপন হস্তে রাজ্যশাসনের ভার লইলেন, তখন তাঁহাদিগকে, ডাকাইতীর দমন নিমিত্ত, অতি কঠিন আইন জারী করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ডাকাইতকে, তাহার নিজ গ্রামে লইয়া গিয়া, ফাঁশী দেওয়া যাইবেক; তাহার পরিবার চির কালের নিমিত্ত, রাজকীয় দাস হইবেক, এবং সেই গ্রামের সমুদয় লোককে দণ্ডভাজন হইতে হইবেক।

এই অরাজক সময়েই অধিকাংশ ভূমি নিষ্কর হয়। সম্রাট বাঙ্গালার সমুদয় রাজস্ব ইঙ্গরেজদিগকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা, কলিকাতায় আদায় না হইয়া, মুরশিদাবাদে আদায় হইত। মালের কাছারীও সেই স্থানেই ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম ও রাজা কান্ত সিংহ, এই তিন ব্যক্তি বাঙ্গালার রাজস্ব সম্পর্কীয় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারাই সমুদয় বন্দোবস্ত করিতেন এবং রাজস্ব আদায় করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। তৎকালে জমীদারেরা কেবল প্রধান কর-

সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত তিন মহাপুরুষের ইচ্ছাকৃত অনবধানবলে, ইঙ্গরেজদিগের চক্ষু ফুটিবার পূর্ব্বে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিঘা সরকারী ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর দান করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করেন।

লার্ড ক্লাইবের প্রস্থানের পর, বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। পর বৎসর, ডিরেক্টরেরা কর্ম্মচারীদিগের লবণ ও অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বাণিজ্য রহিত করিবার নিমিত্ত, চূড়ান্ত হুকুম পাঠাইলেন। তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় বাণিজ্য কেবল দেশীয় লোকেরা করিবেক; কোনও ইয়ুরোপীয় তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন অত্যন্ত ন্যূন ছিল, এজন্য তাঁহারা ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন, বেতন ব্যতিরিক্ত, সরকারী খাজনা হইতে, তাহাদিগকে শতকরা আড়াই টাকার হিসাবে দেওয়া যাইবেক; সেই টাকা সমুদায় সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীরা যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইবেন।

ক্লাইবের প্রস্থানের পর, কোম্পানির কার্য্য সকল পুনর্ব্বার বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। আয় অনেক ছিল বটে, কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা অধিক হইতে লাগিল। ধনাগারে দিন দিন বিষম অনাটন হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতার গবর্ণর, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেখিলেন, অনেক দেনা হইয়াছে, এবং আরও দেনা না করিলে চলে না। তৎকালে টাকা সংগ্রহ করিবার এই রীতি ছিল, কোম্পানির ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা যে

অর্থ সঞ্চয় করিতেন, গবর্ণর সাহেব, কলিকাতার ধনাগারে তাহা জমা লইয়া, লণ্ডন নগরে ডিরেক্টরদিগের উপর সেই টাকার বরাত পাঠাইতেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য প্রেরিত হইত, তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ ব্যতিরেকে, ডিরেক্টরদিগের ঐ হুণ্ডীর টাকা দিবার কোনও উপায় ছিল না। কলিকাতার গবর্ণর যথেষ্ট ধার করিতে লাগিলেন; কিন্তু পূর্ব্ব অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে পণ্য দ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন; সুতরাং ঐ সকল হুণ্ডীর টাকা দেওযা ডিরেক্টরদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এজন্য, তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণরকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, আর এরূপ হুণ্ডী না পাঠাইয়া, এক বৎসর কলিকাতাতেই টাকা ধার করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

ইহাতে এই ফল হইল যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনামারদিগের দ্বারা আপন আপন উপার্জ্জিত অর্থ ইয়ুরোপে পাঠাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ চন্দন নগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরের ধনাগারে টাকা জমা করিয়া দিয়া, বিলাতের অন্যান্য কোম্পানির নামে হুণ্ডী লইতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত সওদাগরেরা ঐ সকল টাকায় পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইয়ুরোপে পাঠাইতেন; হুণ্ডীর মিয়াদ মধ্যেই ঐ সমস্ত বস্তু তথায় পঁহুছিত ও বিক্রীত হইত। এই উপায় দ্বারা, ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য ইয়ুরোপীয় বণিকদিগের টাকার অসঙ্গতি নিবন্ধন কোনও ক্লেশ ছিল না, কিন্তু ইঙ্গরেজ কোম্পানি যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পড়িলেন। ডিরেক্টরেরা নিষেধ করিলেও, কলিকাতার গবর্ণর, অগত্যা পুনর্ব্বার

পূর্ব্ববৎ ঋণ করিয়া ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডে হুণ্ডী পাঠাইলেন, তাহাতে লণ্ডন নগরে কোম্পানির কার্য্য এক বারে উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিল।

নজম উদ্দৌলা, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, নবাব হইয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইল, সৈফ উদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বসন্তরোগে তাঁহার প্রাণান্ত হইলে তদীয় ভ্রাতা মোবারিক উদ্দৌলা তৎপদে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীরা, আপন আপন ব্যয়ের নিমিত্ত, যত টাকা পাইতেন, কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেও তাহাই দিতেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, প্রতিবৎসর তাঁহাকে তত না দিয়া, ১৬ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ করেন।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে, দেশ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনার সময়, দরিদ্র লোকেরা যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইমাত্র কহিলে এক প্রকার বোধগম্য হইতে পারিবেক যে, ঐ দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় তৃতীয় অংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ বৎসরেই, ডিরেক্টরদিগের আদেশ অনুসারে, মুরশিদাবাদে ও পাটনায়, কৌন্সিল অব রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বসমাজ স্থাপিত হয়। তাঁহাদের এই কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা রাজস্ব বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান ও দাখিলা পরীক্ষা করিবেন। কিন্তু রাজস্বের কর্ম্মনির্ব্বাহ তৎকাল পর্য্যন্ত দেশীয় লোকদিগের হস্তে ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশিদাবাদে ও রাজা সিতাব রায় পাটনায়, থাকিয়া পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। ভূমি

সম্পর্কীয় সমুদয় কাগজ পত্রে তাঁহাদের সহী ও মোহর চলিত।

শ্রীযুক্ত বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরীপদ পরিত্যাগ করাতে, কার্টিয়র সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু, কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত, কোম্পানির কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠে। ডিরেক্টরেরা কুরীতি সংশোধন ও ব্যয়লাঘব করিবার নিমিত্ত কলিকাতার পূর্ব্ব গবর্ণর বান্সিটার্ট, স্ক্রাফটন কর্ণল ফোর্ড, এই তিন জনকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইবার পর, আর তাহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সকলে অনুমান করেন, ঐ জাহাজ সমুদয় লোক সহিত সমুদ্রে মগ্ন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কার্টিয়র সাহেব, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরী পরিত্যাগ করিলে, শ্রীযুক্ত ওয়ারন্ হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন। হেষ্টিংস, ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে, এদেশে আইসেন; এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে, এতদ্দেশীয় ভাষা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদে রেসিডেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে গবর্ণরের পদ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা সম্মানের কর্ম্ম আর ছিল না। যখন বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন কেবল হেষ্টিংস তাঁহার বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, হেষ্টিংস কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বর হন। তৎকালে অন্য সকল মেম্বরই বান্সিটার্ট সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন; তিনিই একাকী তাঁহার পোষকতা করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি তথায় নানা সুনিয়ম প্রচলিত করেন; তজ্জন্য ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে, কলিকাতার গবর্ণরের পদ শূন্য হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে, সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

দেশীয় লোকেরা যে রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আয় ক্রমে অল্প হইতেছে। অতএব দেওয়ানী প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে, তাঁহারা যথার্থ দেওয়ান হওয়া, অর্থাৎ রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার আপনাদের হস্তে লইয়া, ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করা, মনস্থ করিলেন। এই নূতন নিয়ম হেষ্টিংস সাহেবকে আসিয়াই প্রচলিত করিতে হইল। তিনি ১৩ই এপ্রিল, গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মে, কৌন্সিলের সম্মতি ক্রমে এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্য্য নির্বাহ করিবেন, যে সকল ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা রাজস্বের কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাদের নাম কালেক্টর হইবেক; কিছু কালের নিমিত্ত, সমুদয় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক, আর কৌন্সিলের চারি জন মেম্বর, প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইঁহারা প্রথমে কৃষ্ণনগরে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বাধিকারীরা অত্যন্ত কম নিরিখে মালগুজারী দিতে চাহিবাতে, তাঁহারা সমুদয় জমী নীলাম করাইতে লাগিলেন। যে জমীদার অথবা তালুকদার ন্যায্য মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন, তিনি আপন বিষয় পূর্ব্ববৎ অধিকার করিতে লাগিলেন; আর যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন, তাঁহাকে পেনৃশন দিয়া, অধিকারচ্যুত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়াইলেন। গবর্ণর স্বচক্ষে সমুদয় দেখিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে মালের কাছারী মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল।

এই রূপে রাজস্বকর্ম্মের নিয়ম পরিবর্ত্ত হওয়াতে, দেশের

দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মেরও নিয়ম পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইল। প্রত্যেক প্রদেশে; এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী দুই বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। ফৌজদারী আদালতে কালেক্টর সাহেব, কাজী ও মুফতি এই কয় জন একত্র হইয়া বিচার করিতেন। আর, দেওয়ানী আদালতেও, কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা করিতেন, দেওয়ান ও অন্যান্য আমলারা তাঁহার সহকারিতা করিত। মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় দুই বিচারালয় স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে যে স্থলে দেওয়ানী বিষয়ের বিচার হইত, তাহার নাম সদর দেওয়ানী আদালত, আর যে স্থানে ফৌজদারী বিষয়ের, তাহার নাম নিজামৎ আদালত, রহিল।

এ পর্য্যন্ত, আদালতে যত টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, প্রাড়বিবাক তাহার চতুর্থ অংশ পাইতেন, এক্ষণে তাহা রহিত হইল; অধিক জরিমানা রহিত হইয়া গেল; মহাজনদিগের স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে রুদ্ধ করিয়া টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহাও নিবারিত হইল; আর দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। ইঙ্গরেজেরা, আপনাদিগের প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালা শাসন করিবার নিমিত্ত, প্রথমে এই সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন।

ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই বাঙ্গালার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। তাঁহার পদপ্রাপ্তির দিবস অবধি, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহারা ইহাও বিস্মৃত হয়েন নাই

যে, যখন তিনি, মীর জাফরের রাজত্বসময়ে, ঢাকার চাকলায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন, তথায় তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা তহবীল ঘাটি হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার নামে এ অভিযোগও করিয়াছিল, যে, তিনি, ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দারুণ অকালের সময়, সমধিক লাভ প্রত্যাশায়, সমুদায় শস্য একচাটিয়া করিয়াছিলেন। আর সকলে সন্দেহ করিত, তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগকেও অধিক নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি মুরশিদাবাদে কর্ম্ম করিতেন, তখন বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। নায়েব সুবাদার ছিলেন, তদনুসারে রাজস্বের সমুদয় বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে ছিল, আর নায়েব নাজিম ছিলেন, সুতরাং পুলিসেরও সমুদয় ভার তাঁহারই হস্তে ছিল। ডিরেক্টরেরা বুঝিতে পারিলেন, যত দিন তাঁহার হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিবেক, কোনও ব্যক্তি তাঁহার দোষ প্রকাশে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। অতএব তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁকে কয়েদ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে, এবং তাঁহার সমুদয় কাগজ পত্র আটক করিতে, হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণরের পদে অধিরূঢ় হইবার দশ দিবস পরেই, ডিরেক্টরদিগের এই আজ্ঞা তাঁহার নিকট পঁহুছে। যৎকালে ঐ আজ্ঞা পঁহুছিল, তখন অধিক রাত্রি হইয়াছিল; এজন্য সে দিবস তদনুযায়ী কার্য্য করা হইল না। পর দিন প্রাতঃকালে, তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদের রেসি-

ডেণ্ট মিডিল্‌টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে, রেজা খাঁ সপরিবারে জলপথে কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। মিডিল্‌টন সাহেব তাঁহার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁ চিতপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অকস্মাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত, এক জন কৌন্সিলের মেম্বর প্রেরিত হইলেন। আর হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন, আমি কোম্পানির ভৃত্য, আমাকে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইয়াছে, নতুবা আপনকার সহিত আমার যেরূপ আত্মীয়তা আছে, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবেক না, জানিবেন।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়েরও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এজন্য তিনিও কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা অল্প দিনেই সমাপ্ত হইল। পরীক্ষায় তাঁহার কোনও দোষ পাওয়া গেল না; অতএব তিনি মান পূর্ব্বক বিদায় পাইলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক তাঁহার সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও লিখিয়াছেন, প্রধানপদারূঢ় অন্যান্য লোকের ন্যায়, তিনিও অন্যায় আচরণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের নিকট অধিক ধন গ্রহণ করিতেন।

তাঁহাকে অপরাধী বোধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অমর্য্যাদা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানার্থে কিছু পারিতোষিক দেওয়া উচিত বোধ হওয়াতে কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকে এক মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং বিহারের রায় রাইয়াঁ করিলেন। কিন্তু অপরাধিবোধে কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার

যে অপমান বোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি এক বারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। ইঙ্গরেজেরা এ পর্য্যন্ত এদেশীয় যত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহারা রাজা সিতাব রায়ের সর্ব্বদা অত্যন্ত গৌরব করিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে, অপরাধিবোধে অধিকারচ্যুত করা, কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনা এবং দোষের আশঙ্কা করিয়া পরীক্ষা করা, এই সকল অপমান তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ, পাটনা প্রতিগমন করিয়া, ঐ মনঃপীড়াতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণ সিংহ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাটনা প্রদেশ উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাফলের নিমিত্ত যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা সিতাব রায়ই তাহার আদিকারণ। তাঁহার উদ্যোগেই ঐ প্রদেশে দ্রাক্ষা ও খরমুজের চাস আরম্ভ হয়।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষায় অনেক কাল লাগিয়াছিল। নন্দকুমার তাঁহার দোষোদ্ঘাটক নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবেক। কিন্তু দ্বৈবার্ষিক বিবেচনার পর নির্দ্ধারিত হইল, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দোষ; নির্দোষ হইলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্ব কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন না।

মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে পর, নিজামতে তাঁহার যে কর্ম্ম ছিল, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। নবাবকে শিক্ষা দেওয়ার ভার মণিবেগমের প্রতি অর্পিত হইল আর, সমুদয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণার্থে, হেষ্টিংস সাহেব, নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিযুক্ত করিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর এই নিয়োগ বিষয়ে বিস্তর আপত্তি

করিলেন; কহিলেন, গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায়, তাহার পিতাকে নিযুক্ত করা হইতেছে; কিন্তু তাহার পিতাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হেষ্টিংস, তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া, গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডে কোম্পানির বিষয়কর্ম্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। ১৭৬৭ সালে লার্ড ক্লাইবের প্রস্থান অবধি, ১৭৭২ সালে হেষ্টিংসের নিয়োগ পর্য্যন্ত, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের কার্য্যও তেমনই বিশৃ-ঙ্খল হইয়াছিল। যৎকালে কোম্পানির দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাদৃশ সময়ে ডিরেক্টরেরা মূলধনের অধিকারীদিগকে, শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে, মুনফার অংশ দিলেন। যদি তাঁহাদের কার্য্যের বিলক্ষণ রূপ উন্নতি থাকিত, তথাপি এরূপ মুনফা দেওয়া কোনও প্রকারে উচিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপ পাগলামী করিয়া ডিরেক্টরেরা দেখিলেন ধনাগারে এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই। তখন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে, প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ, টাকা ধার করিতে হইল। পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া, তাঁহাদিগকে এক কোটি টাকা ধার চাহিতে হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে কোম্পানির বিষয়কর্ম্মের এই প্রকার দুরবস্থা প্রকাশ হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদের হস্তে

আনিতে মনন করিলেন। কোম্পানির শাসনে যে সকল অন্যায় আচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক কমিটী নিয়োজিত হইল। ঐ কমিটী বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন, সম্পূর্ণ রূপে নিয়ম পরিবর্ত্ত না হইলে, কোম্পানির পরিত্রাণের উপায় নাই। তাঁহারা, সমুদয় দোষ সংশোধনার্থে পার্লিমেণ্টে নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ডিরেক্টরেরা তদ্বিষয়ে, যত দূর পারেন, আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, তাঁহাদের সমস্ত আপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন।

অতঃপর, ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মের সমুদয় প্রণালী ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই পরিবর্ত্তিত হইল। ডিরেক্টর মনোনীত করণের রীতিও কিয়ৎ অংশে পরিবর্ত্তিত হইল। ইংলণ্ডে কোম্পানির কার্য্যে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহার অনেক সংশোধন হইল। ইহাও আদিষ্ট হইল যে, প্রতিবৎসর ছয় জন ডিরেক্টরকে পদ পরিত্যাগ করিতে হইবেক, এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে, আর ছয় জনকে মনোনীত করা যাইবেক। আরও অনুমতি হইল যে, বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইবেন, অন্যান্য রাজধানীর রাজনীতিঘটিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীনে থাকিবেক।

গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা বিষয়ে সর্ব্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত; অতএব নিয়ম হইল, গবর্ণর জেনেরল

ফোর্ট উইলিয়মের একমাত্র গবর্ণর ও সেনানী হইবেন। গবর্ণর জেনেরল, কৌন্সিলের মেম্বর ও জজদিগকে বাণিজ্য করিতে নিষেধ হইল। এজন্য, গবর্ণরের আড়াই লক্ষ ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের আশি হাজার টাকা বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত হইল। ইহাও আজ্ঞপ্ত হইল যে, কোম্পানির অথবা রাজার কার্য্যে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। আর, ডিরেক্টরদিগের প্রতি আদেশ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় যে সকল কাগজ পত্র আসিবেক, সে সমুদয় তাঁহারা রাজমন্ত্রিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

বিচার নির্ব্বাহ বিষয়ে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামে এক বিচারালয় স্থাপিত হইবেক। তথায় বার্ষিক অশীতি সহস্র মুদ্রা বেতনে এক জন চীফ জষ্টীস অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্ত্তা, ও ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বেতনে তিন জন পিউনি জজ অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিচারকর্ত্তা থাকিবেন। এই জজেরা কোম্পানির অধীন হইবেন না, স্বয়ং রাজা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। আর, ঐ ধর্ম্মাধিকরণে ইংলণ্ডীয় ব্যবহারসংহিতা অনুসারে ব্রিটিশ সব্জেক্টদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবেক। পরিশেষে, এই অনুমতি হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা প্রথম এই যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন, ১৭৭৪ সালের ১লা আগষ্ট তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে সবিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এজন্য তিনি গবর্ণর

জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কৌন্সিলে তাঁহার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার্থ, চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে, বারওয়েল সাহেব বহু কাল অবধি এতদ্দেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; আর কর্ণেল মন্সন, সর জন ক্লবরিং ও ফ্রান্সিস সাহেব, এই তিন জন ইহার পূর্ব্বে কখনও এ দেশে আইসেন নাই।

হেষ্টিংস, এই তিন নূতন মেম্বরের মান্দ্রাজ পঁহুছিবার সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তাঁহাদিগকে এক অনুরাগসূচক পত্র লিখিলেন। তাঁহারা খাজরীতে পঁহুছিলে, তিনি কৌন্সিলের প্রধান মেম্বরকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন এবং তাঁহার এক জন নিজ পারিষদও স্বাগত জিজ্ঞাসার্থে প্রেরিত হইলেন। কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদের যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, লার্ড ক্লাইব ও বান্সিটার্ট সাহেবেরও সেরূপ হয় নাই। আসিবা মাত্র, সতরটা সেলামি তোপ হয় ও তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত, কৌন্সিলের সমুদয় মেম্বর একত্র হন। তথাপি তাঁহাদের মন উঠিল না।

তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের নিকট এই অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন, আমরা সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হই নাই, আমাদের সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত সৈন্য বহিষ্কৃত করা যায় নাই, সেলামি তোপও উপযুক্ত সংখ্যায় হয় নাই, আমাদের সংবর্দ্ধনা কৌন্সিলগৃহে না করিয়া হেষ্টিংসের বাটীতে করা হইয়াছিল, আর আমরা যে নূতন গবর্ণমেণ্টের অবয়ব স্বরূপ আসিয়াছি, উপযুক্ত সমারোহ পূর্ব্বক, তাহার ঘোষণা করা হয় নাই।

২০এ অক্টোবর, কৌন্সিলের প্রথম সভা হইল; কিন্তু বারওয়েল সাহেব তখন পর্য্যন্ত না পঁহুছিবাতে, সে দিবস কেবল নূতন গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা মাত্র হইল; অন্যান্য সমুদয় কর্ম্ম আগামী সোমবার ২৪এ তারিখে বিবেচনার নিমিত্ত রহিল। নূতন মেম্বরেরা ভারতবর্ষের কার্য্য কিছুই অবগত ছিলেন না; অতএব, সভা আরম্ভ হইলে, হেষ্টিংস সাহেব কোম্পানির সমুদয় কার্য্য যে অবস্থায় চলিতেছিল, তাহার এক সবিশেষ বিবরণ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু প্রথম সভাতেই এমন বিবাদ উপস্থিত হইল যে, ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন তদবধি প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। বারওয়েল সাহেব একাকী গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ছিলেন। অন্য তিন জন মেম্বর সকল বিষয়ে সর্ব্বদা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষেই মত দিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, সুতরাং গবর্ণর জেনেরল কেবল সাক্ষিগোপাল হইলেন; কারণ, যে স্থলে বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপর কোনও বিষয়ের ভার থাকে, তথায় মতভেদ হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মত অনুসারেই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই পতিত হইল। তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে, হেষ্টিংস এতদ্দেশে যে সকল ঘোরতর অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত ছিলেন এবং হেষ্টিংসকে অতি অপকৃষ্ট লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; এজন্য হেষ্টিংস যাহা কহিতেন, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া, এক বারে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন; সুতরাং, তাঁহারা যে রাগদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য্য করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

হেষ্টিংস সাহেব, কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে, মিডিল্‌টন সাহেবকে লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে নূতন মেম্বরেরা তাঁহাকে সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন; আর হেষ্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার নিকট নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, এরূপ হইলে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক যে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণরকে গবর্ণমেণ্টের প্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে; এক্ষণে, তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতাশূন্য দেখিলে, সহজে বোধ করিতে পারে, যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা, রোষ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

দেশীয় লোকেরা, অল্প কাল মধ্যে, কৌন্সিলের এই প্রকার বিবাদের বিষয় অবগত হইলেন, এবং ইহাও জানিতে পারিলেন, হেষ্টিংস সাহেব এত কাল সকলের প্রধান ছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই। অতএব যে সকল লোক তৎকৃত কোনও কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয় মেম্বরদিগের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে, তাহাদের অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়েই, বর্দ্ধমানের অধিপতি মৃত তিলকচন্দ্রের মহিলা, স্বীয় তনয়কে সমভিব্যাহারে

করিয়া, কলিকাতায় আগমন করিলেন। তিনি এই আবেদন পত্র প্রদান করিলেন, আমি রাজার মৃত্যুর পর কোম্পানির ইঙ্গরেজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছি, তন্মধ্যে হেষ্টিংস সাহেব ১৫০০০০৲ টাকা লইয়া ছিলেন। হেষ্টিংস বাঙ্গালা ও পারসীতে হিসাব দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু রাণী কিছুই দেখাইলেন না। কোনও ব্যক্তিকে সম্মান দান করা এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রধান ব্যক্তির অধিকার ছিল; কিন্তু হেষ্টিংসের বিপক্ষেরা, তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া, আপনারা শিশু রাজারে খেলাত দিলেন।

অতি শীঘ্র শীঘ্র হেষ্টিংসের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক জন এই বলিয়া দরখাস্ত দিল যে, হুগলীর ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে ৩৬০০০৲ ও তাঁহার দেয়ানকে ৪০০০৲ টাকা দেন। আমি ৩২০০০৲ টাকা পাইলেই ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি। উপস্থিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, সাক্ষ্য লওয়া গেল। হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরেরা কহিলেন, যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদনুসারে ফৌজদার পদচ্যুত হইলেন। অন্য এক ব্যক্তি ন্যূন বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু অভিযোক্তার কিছুই হইল না।

এক মাস অতীত না হইতেই, আর এই এক অভিযোগ উপস্থিত হইল, মণিবেগম নয় লক্ষ টাকার হিসাব দেন নাই। পীড়াপীড়ি করাতে, বেগম কহিলেন, হেষ্টিংস সাহেব যখন আমাকে নিযুক্ত করিতে আইসেন, আমোদ

উপলক্ষে ব্যয় করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়াছি। হেষ্টিংস কহিলেন, আমি ঐ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু সরকারী হিসাবে খরচ করিয়া কোম্পানির দেড় লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছি। হেষ্টিংস সাহেবের এই হেতুবিন্যাস কাহারও মনোনীত হইল না।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, অভিযোগ করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারে। অতএব, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া, মণিবেগমকে ও আমার পুত্র গুরুদাসকে মুরশিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন, সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারকে কৌন্সিলের সম্মুখে আনয়ন করা যাউক। হেষ্টিংস উত্তর করিলেন, আমি যে সভার অধিপতি, তথায় আমার অভিযোক্তাকে আসিতে দিব না; বিশেষতঃ, এমন বিষয়ে অপদার্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মত হইয়া, গবর্ণর জেনেরলের পদের অমর্যাদা করিব না, বরং এই সমস্ত ব্যাপার সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করা যাউক। ইহা কহিয়া, হেষ্টিংস গাত্রোত্থান করিয়া কৌন্সিল-গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, বারওয়েল সাহেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের পর, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা নন্দকুমারকে কৌন্সিলগৃহে আহ্বান করিলে, তিনি এক পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, মণিবেগম যখন বাঁহা ঘুস দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে, বেগম

গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লিখিয়াছেন; সর জন ডাইলি সাহেব, নন্দকুমারের পঠিত পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত, ঐ পত্র বাহির করিয়া দিলেন। মোহর মিলিল, হস্তাক্ষরের ঐক্য হইল না। যাহা হউক, কৌন্সিলের মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া স্থির করিলেন এবং হেষ্টিংসকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হইলেন না।

এই বিষয় নিষ্পত্তি না হইতেই, হেষ্টিংস নন্দকুমারের নামে, চক্রান্তকারী বলিয়া, সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই অভিযোগের কিছু দিন পরেই, কামাল উদ্দীন নামে এক জন মুসলমান এই অভিযোগ উপস্থিত করিল, নন্দকুমার এক কাগজে আমার নাম জাল করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, উক্ত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া নন্দকুমারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা জজদিগের নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, জামীন লইয়া নন্দকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু জজেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, জজেরা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করিলেন। জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; জজেরা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ বিধান করিলেন। তদনুসারে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, তাঁহার ফাঁসী হইল।

যে দোষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল, তাহা যদি তিনি যথার্থ করিয়া থাকেন, সুপ্রীম

কোর্ট স্থাপিত হইবার ছয় বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলেন; সুতরাং তৎসংক্রান্ত অভিযোগ কোনও ক্রমে সুপ্রীম কোর্টের গ্রাহ্য ও বিচার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যে আইন অনুসারে এই সুবিচার হইল, ন্যায়পরায়ণ হইলে, প্রধান জজ সর ইলাইজা ইম্পি, কদাচ উপস্থিত ব্যাপারে ঐ আইনের মর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করিতেন না। কারণ, ঐ আইন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষয়ে প্রচলিত হইবেক বলিয়া নিরূপিত হব নাই। ফলতঃ, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড ন্যায়মার্গ অনুসারে বিহিত হইয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে এক বারে হতবুদ্ধি হইলেন। কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকলেই গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন; তাঁহারাও, অবিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এতদ্দেশের এক জন অতি প্রধান লোক ছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সৌভাগ্যদশা উদয় হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার এরূপ আধিপত্য ছিল যে, ইঙ্গরেজেরাও বিপদ পড়িলে সময়ে সময়ে তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন যথার্থ বটে; কিন্তু ইম্পি ও হেষ্টিংস তদপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।

নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন,

নন্দকুমার জীবিত থাকিতে আমার ভদ্রস্থতা নাই, অতএব যে কোনও উপায়ে উহার প্রাণবধ সাধন করা আবশ্যক। তদনুসারে, কামাল উদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্ম্মাসনারূঢ় ইম্পি গুবর্ণর জেনেরলের পদারূঢ় হেষ্টিংসের পরিতোষার্থে এক বারেই ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনা শূন্য হইয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন। হেষ্টিংস তিন চারি বৎসর পরে এক পত্র লিখিয়াছিলেন ; তাহাতে ইম্পিকৃত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, এক সময়ে ইম্পির আনুকূল্যে আমার সৌভাগ্য ও সম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে। এই লিখন দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অমূলক নহে, আর সুপ্রীম কোর্টের অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড না হইলে, তিনি সে সমুদায় সপ্রমাণও করিয়া দিতেন ; সেই ভয়েই হেষ্টিংস, ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ সাধন করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষার ফলিতার্থ সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা কহিলেন, আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব তাঁহারা, নবাবের সাংসারিক কর্ম্ম হইতে গুরুদাসকে বহিষ্কৃত করিয়া, তৎপদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সুপ্রীম কৌন্সিলের সাহেবেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এমন অবসর নাই যে, কলিকাতা সদর নিজামৎ আদালতে

স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে পারেন। এজন্য, পূর্ব্বপ্রণালী অনুসারে, পুনর্ব্বার ফৌজদারী আদালত ও পুলিসের ভার এক জন দেশীয় লোকের হস্তে সমর্পণ করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে ঐ আদালত কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে নীত হইল এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তথাকার প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।
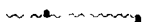
ক্রমে ক্রমে রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এই অভিপ্রায়ে ১৭৭২ সালে, পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত, জমী সকল ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরেই দৃষ্ট হইল, জমীদারেরা যত কর দিতে সমর্থ, তাহার অধিক ইজারা লইয়াছেন। খাজনা ক্রমে ক্রমে বিস্তর বাকী পড়িল। ফলতঃ, এই পাঁচ বৎসরে এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা রেহাই দিয়াও, ইজারদারদিগের নিকট এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী রহিল, তন্মধ্যে অধিকাংশেরই আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব, কৌন্সিলের উভয় পক্ষীয়েরাই, *নূতন বন্দোবস্তের নিমিত্ত, এক এক* প্রণালী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু ডিরেক্টরেরা উভয়ই অগ্রাহ্য করিলেন। ১৭৭৭ সালে, পাট্টার মিয়াদ গত হইলে, ডিরেক্টরেরা এক বৎসরের নিমিত্ত ইজারা দিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপ বৎসরে বৎসরে ইজারা দিবার নিয়ম ১৭৮২ সাল পর্য্যন্ত প্রবল ছিল।

১৭৭৬ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে, কর্ণেল মন্সন সাহেবের মৃত্যু হইল; সুতরাং, তাঁহার পক্ষের দুই জন মেম্বর অবশিষ্ট থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলে পুনর্ব্বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন; কারণ, সমসংখ্য স্থলে গবর্ণর জেনেরলের মতই বলবৎ হইত।

১৭৭৮ সালের শেষ ভাগে, নবাব মুবারিক উদ্দৌলা, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, এই প্রার্থনায় কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র

লিখিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ আমার সহিত সর্ব্বদা কর্কশ ব্যবহার করেন; অতএব ইঁহাকে স্থানান্তরিত করা যায়। তদনুসারে, হেষ্টিংস সাহেবের মতক্রমে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, নায়েব স্থবাদারের পদ রহিত করা গেল, এবং নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ ও আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের ভার মণিবেগমের প্রতি অর্পিত হইল। ডিরেক্টরেরা এই বন্দোবস্তে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি ত্বরায় এই আদেশ পাঠাইলেন, নায়েব স্থবাদারের পদ পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া, তাহাতে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত ও মণিবেগমকে পদচ্যুত, করা যায়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালা অক্ষরে সর্ব্বপ্রথম এক পুস্তক মুদ্রিত হয়। অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হালহেড সাহেব, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, এতদ্দেশে আসিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে কোনও ইয়ুরোপীয় সেরূপ শিখিতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অর্পিত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন, এতদ্দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরে, তাঁহার আদেশ ও আনুকূল্যে হালহেড সাহেব, হিন্দু ও মুসলমানদিগের সমুদয় ব্যবহারশাস্ত্র দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ভাষাতে এক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থ, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং বোধ হয়, ইঙ্গরেজদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, তিনি বাঙ্গালাভাষায় এক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। উহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে রাজধানীতে ছাপার যন্ত্র ছিল না; উক্ত গ্রন্থ হুগলীতে মুদ্রিত হইল। বিখ্যাত চার্লস উইল্কিন্স সাহেব এ দেশের নানা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও বিলক্ষণ উৎসাহশালী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত, দেশের পক্ষে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ঐ বিচারালয় ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। কোম্পানির রাজ্যশাসনের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষে আসিবার সময়, জজদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রজাদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে; সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের ক্লেশ নিবারণের এক মাত্র উপায়। তাঁহারা চাঁদপালঘাটে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দেশীয় লোকেরা রিক্ত পদে গমনাগমন করিতেছে। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই! প্রজাদের ক্লেশের পরিসীমা নাই; আবশ্যক না হইলে আর সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমাদের কোর্ট ছয় মাস চলিলেই, এই হতভাগ্যদিগকে জুতা ও মোজা পরাইতে পারিব।

ব্রিটিস সবজেক্ট, অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ

ও মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্বর্ত্তী সমস্ত লোক ঐ কোর্টের এলাকার মধ্যে ছিলেন। আর ইহাও নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যে সকল লোক সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় কোম্পানি অথবা ব্রিটিস্ সব্জেক্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহারাও ঐ বিচারালয়ের অধীন হইবেক। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, এই বিধি অবলম্বন করিয়া, এতদ্দেশীয় দূরবর্ত্তী লোকদিগের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিতেন, যে সকল লোক কোম্পানিকে কর দেয়, তাহারাও কোম্পানির চাকর। পার্লিমেণ্টের অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছিল যে, কোর্টের ক্ষমতাব বিষয় স্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন নাই। পার্লিমেণ্ট এক দেশের মধ্যে পরস্পর নিরপেক্ষ অথচ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পরাক্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ উভয়ের পরস্পর বিবাদানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুপ্রীম কোর্টের কার্য্যারম্ভ হইবা মাত্র, তথাকার বিচারকেরা আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি কোনও ব্যক্তি ঐ আদালতে গিয়া শপথ করিয়া কহিত, অমুক জমীদার আমার টাকা ধারেন, তিনি শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও, তাঁহার নামে তৎক্ষণাৎ পরোয়ানা বাহির হইত, এবং কোনও ওজর না শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিবা জেলখানায় রাখা যাইত; পরিশেষে, আমি সুপ্রীম কোর্টের অধীন নহি, এই বাক্য বারংবার কহিলেই সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতি ও অপমান হইত, তাহার কোনও প্রতিবিধান হইত না। এই কুরীতির দোষ অল্প কাল মধ্যেই প্রকাশ পাইতে

লাগিল। যে সকল প্রজা ইচ্ছা পূর্ব্বক কর দিত না, তাহারা, জমীদার ও তালুকদারদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কলিকাতায় লইয়া যাইতে দেখিয়া, রাজস্ব দেওয়া এক বারেই রহিত করিল। প্রথম বৎসর সুপ্রীম কোর্টের জজেরা সকল জিলা-তেই এইরূপ পরোয়ানা পাঠাইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে দেশ মধ্যে সমুদয় লোকেরই চিত্তে যৎপরোনাস্তি ত্রাস ও উদ্বে-গের সঞ্চার হইল। জমীদারেরা, এই ঘোরতর নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগি-লেন। যে আইন অনুসারে তাঁহারা বিচারার্থে কলিকাতায় আনীত হইতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুপ্রীম কোর্ট ক্রমে ক্রমে এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রাজস্ব আদায়ের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তৎকালে রাজস্ব কার্য্যের ভার প্রবিন্সল কোর্ট অর্থাৎ প্রদেশীয় বিচারালয়ের প্রতি অর্পিত ছিল। পূর্ব্বাবধি এই রীতি ছিল, জমীদারেরা কর দান বিষয়ে অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া আদায় করা যাইত। এই পুরাতন নিয়ম তৎকাল পর্য্যন্ত প্রবল ও প্রচ-লিত ছিল। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। করদানে অমনোযোগী ব্যক্তিরা এই রূপে কয়েদ হইলে, সকলে তাহাদিগকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পরামর্শ দিত। তাহারাও, আপীল করিবা মাত্র, জামীন দিয়া খালাস পাইত। জমীদারেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিলেই আর কয়েদ থাকিতে হয় না, অতএব সকলেই কর দেওয়া রহিত করিলেন। এই রূপে রাজস্বসংগ্রহ প্রায় এক প্রকার রহিত হইয়া আসিল।

সুপ্রীম কোর্ট ক্রমে সর্ব্বপ্রকার বিষয়েই হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। মফঃসলের ভূমিসংক্রান্ত মোকদ্দমাও তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং জজেরাও, জিলা আদালতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইচ্ছাক্রমে ডিক্রী দিতে ও হুকুম জারী করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ইজারদার অঙ্গীকৃত কর দানে অসম্মত হইলে, তাহার ইজারা বিক্রয় হইত। কিন্তু সে নূতন ইজারদারকে সুপ্রীম কোর্টে আনিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিত। কোনও জমীদার একটা বিষয় ক্রয় করিলে, যোত্রহীনেরা সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ করিত এবং তিনি আইনমতে খাজনা আদায় করিয়াছেন এই অপরাধে দণ্ডনীয় ও অবমানিত হইতেন।

সুপ্রীম কোর্ট প্রদেশীয় ফৌজদারী আদালতের উপরেও ক্ষমতাপ্রকাশ আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আদালতের কার্য্য মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা কহিলেন, নবাব মুবারিক উদ্দৌলা সাক্ষিগোপাল মাত্র, সে কিসের রাজা, তাহার সমুদয় রাজ্য মধ্যে আমাদের অধিকার। নবাব ইংলণ্ডের অধিপতির অথবা ইংলণ্ডের আইনের অধীন ছিলেন না; তথাপি সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার নামে পরোয়ানা জারী করা ন্যায্য বিবেচনা করিলেন। জজেরা স্পষ্টই কহিতেন, রাজ্যশাসন অথবা রাজস্বকার্য্যের সহিত যে যে বিষয়ের সম্পর্ক আছে, আমরা সে সমুদয়েরই কর্ত্তা; যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেক, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তাহার গুরু দণ্ড বিধান করিব। কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অবিচার ও অত্যাচার হইতে দেশীয় লোকদিগকে পরিত্রাণ করিবার

জন্য, এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে, এত অধিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট না হইলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ, সুপ্রীম কোর্টকে সর্ব্বপ্রধান ও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টকে অকিঞ্চিৎকর করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

উপরিলিখিত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী মোকদ্দমার কথা উল্লিখিত হইতেছে।

পাটনানিবাসী এক জন ধনবান মুসলমান, আপন পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া, পরলোক যাত্রা করেন। এইরূপ জনরব হইয়াছিল যে ধনী ভ্রাতৃপুত্রকে দত্তক পুত্র করিয়া যান। ধনীর পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ে, ধনাধিকার বিষয়ে বিবদমান হইয়া, পাটনার প্রবিন্সল কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। জজেরা, কার্য্যনির্ব্বাহের প্রচলিত রীতি অনুসারে, কাজী ও মুফতীকে ভার দেন যে, তাঁহারা সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া, মুসলমানদিগের সরা অনুসারে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন। ইহাতে তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন, বাদী প্রতিবাদী যে সকল দলীল দেখায়, সে সমুদায় জাল; তাহাদের এক ব্যক্তিও প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহে, সুতরাং ঐ সম্পত্তির বিভাগ সরা অনুসারে করা আবশ্যক। তাঁহার সমস্ত ধনের চতুর্থ অংশ মৃত ব্যক্তির পত্নীকে দিয়া, অবশিষ্ট বার আনা তাহার ভ্রাতাকে দেওয়াইলেন। এই ভ্রাতার পুত্রকে ধনী দত্তক করিয়া যান।

ঐ অবীরা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিল। এই মোকদ্দমা যে স্পষ্টই সুপ্রীম কোর্টের এলাকার বহির্ভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জজেরা, আপনাদের অধিকার-

ভুক্ত করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, মৃত ব্যক্তি সরকারী জমা রাখিত, সুতরাং সে কোম্পানির কর্ম্মকারক; সমুদয় সরকারী কর্ম্মকারকের উপর আমাদের অধিকার আছে। তাঁহারা ইহাও কহিলেন, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, পাটনার প্রবিন্সল জজদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, তাঁহারা কোনও মোকদ্দমা, নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত, কাহাকেও সোপর্দ্দ করিতে পারেন। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, এই মোকদ্দমার সানি তজবীজ আবশ্যক। পরে, তাঁহাদের বিচারে ঐ অবীরার পক্ষে জয় হইল, এবং সে তিন লক্ষ টাকা পাইল।

তাঁহারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে; ✓কাজী, মুফতী ও ধনীর ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত, এক জন সারজন পাঠাইলেন; কহিয়া দিলেন, যদি চারি লক্ষ টাকার জামীন দিতে পারে, তবেই ছাড়িবে, নতুবা গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে। কাজী আপন কাছারী হইতে বাটী যাইতেছেন, এমন সময়ে, সুপ্রীম কোর্টের লোক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

এইরূপ ব্যাপার দর্শনে প্রজাদের অন্তঃকরণে অবশ্যই বিরুদ্ধ ভাব জন্মিতে পারে, এই নিমিত্ত প্রবিন্সল কোর্টের জজেরা অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা লোপ পাইল, এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ এক বারেই রহিত হইল। অনন্তর, আর অধিক অনিষ্ট না ঘটে, এজন্য তাঁহারা তৎকালে কাজীর জামীন হইলেন।

যে যে ব্যক্তি, প্রবিন্সল কোর্টের হুকুম অনুসারে, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাদের

সকলকেই অপরাধী করিলেন, এবং সকলকেই রুদ্ধ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, সিপাই পাঠাইয়া দিলেন; কাজী বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিবার কালে পথি মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মুফতীও অন্যুন চারি বৎসর জেলে থাকিলেন; পরিশেষে পার্লিমেণ্টের আদেশ অনুসারে মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের অপরাধ এই, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জজেরা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রবিন্সল কোর্টের জজের নামেও সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত করিয়া, তাঁহার ১৫০০০ টাকা দণ্ড করিলেন; ঐ টাকা কোম্পানির ধনাগার হইতে দত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টের জজেরা ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বিষয়ে, যে রূপে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। সুপ্রীম কোর্টের এক ইয়ুরোপীয় উকীল ঢাকায় থাকিতেন। এক জন সামান্য পেয়াদা কোনও কুকর্ম করাতে, ঐ নগরের ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে, এই আদেশ হইল, সে ব্যক্তি যাবৎ না আত্মদোষ ক্ষালন করে, তাবৎ তাহাকে কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হইবেক।

সকলে পরামর্শ দিয়া তাহাকে সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করাইল। অনন্তর, পেয়াদাকে অকারণে রুদ্ধ করিয়াছে এই সূত্র ধরিয়া, সুপ্রীম কোর্টের এক জন জজ, ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে কয়েদ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, পরোয়ানা বাহির করিলেন। ফৌজদার, আপন বন্ধুবর্গ ও

আদালতের আমলাগণ লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত ইয়ুরোপীয় উকীল এক জন বাঙ্গালিকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি, প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার দেওয়ানকে কয়েদ করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু সকলে প্রতিবাদী হওয়ায়, তাহাকে আপন মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইল। উকীল, এই বৃত্তান্ত শুনিবা মাত্র, কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ সঙ্গে লইয়া, বল পূর্ব্বক ফৌজদারের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যম করিলেন। সেই বাটীতে ফৌজদারের পরিবার থাকিত, এজন্য তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাতে ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হইল। উকীলের এক জন অনুচর, ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল; এবং উকীলও নিজে, এক পিস্তল বাহির করিয়া, ফৌজদারের সম্বন্ধীকে গুলি করিলেন। কিন্তু দৈবযোগে তাহা মারাত্মক হইল না। সুপ্রীম কোর্টের জজ্ হাউড সাহেব, এই ব্যাপার শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ঢাকার সৈন্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি উকীলের সাহায্য করিবেন; আর ইহাও লিখিলেন, আপনি উকীলকে জানাইবেন, তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট তুষ্টি জন্মিয়াছে; সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিবেন; ঢাকার প্রবিন্সল কৌন্সিলের সাহেবেরা গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন, ফৌজদারী আদালতের সমুদয় কার্য্য এক কালে স্থগিত হইল; এরূপ অত্যাচারের পর, সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আর লোক পাওয়া দুষ্কর হইবে। গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা দেখিলেন

সুপ্রীম কোর্ট হইতেই গবর্ণমেণ্টের সমুদয় ক্ষমতা লোপ পাইল। কিন্তু কোনও প্রকারে তাঁহাদের সাহস হইল না যে, কিছু প্রতিবিধান করেন। জজেরা বলিতেন, আমরা ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত; কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মকারক অপেক্ষা আমাদের ক্ষমতা অনেক অধিক; যে যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেক, তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দিব। যাহা হউক, পরিশেষে এমন এক বিষয় ঘটিয়া উঠিল যে, উভয় পক্ষকেই পরস্পর স্পষ্ট বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

কাশিজোড়ার রাজার কলিকাতাস্থ কর্ম্মাধ্যক্ষ কাশীনাথ বাবু, ১৭৭৯ সালের ১৩ই আগষ্ট, রাজার নামে সুপ্রীম কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে রাজার উপর এক পেরোয়ানা বাহির হইল এবং তিন লক্ষ টাকার জামীন চাহা গেল। সেই পরোয়ানা এড়াইবার নিমিত্ত, তিনি পলায়ন করাতে, উহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিল। তদনন্তর, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য, আর এক পরোয়ানা বাহির হইল। সরিফ সাহেব, ঐ ব্যাপার সমাধা করিবার নিমিত্ত, এক জন সারজন ও ষাটিজন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রেরণ করিলেন।

রাজা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন, সুপ্রীম কোর্টের লোকেরা আসিয়া আমার লোক জনকে প্রহার ও আঘাত করিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, জিনিস পত্র লুঠ করিয়াছে, দেবালয় অপবিত্র করিয়াছে, দেবতার অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া লইয়াছে, খাজনা

আদায় বন্ধ করিয়াছে, এবং রাইয়তদিগকে খাজনা দিতে মানা করিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের বৈঠকে এই নির্দ্ধার্য্য করিলেন, অতঃপর সতর্ক হওয়া উচিত ; এমন সকল বিষয়েও ক্ষান্ত থাকিলে, রাজ্যশাসনের এক বারে লোপাপত্তি হয় ; অনন্তর, রাজাকে সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মেদনীপুরের সেনাপতিকে আজ্ঞা লিখিলেন, তুমি সরিফের লোক সকল আটক করিবে। এই আজ্ঞা পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায়, তাহাদের দৌরাত্ম্য ও রাজার বাটী লুঠ নিবারণ হইতে পারিল না ; কিন্তু ফিরিয়া আসিবার কালে সকলে কয়েদ হইল।

সেই সময়ে গবর্ণর জেনেরল ইহাও আদেশ করিলেন যে, যে সমুদয় জমীদার, তালুকদার ও চৌধুরী ব্রিটিস সবজেক্ট, অথবা বিশেষ নিয়মে বদ্ধ নহেন, তাঁহারা যেন সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞা প্রতিপালন না করেন ; আর, প্রদেশীয় অধ্যক্ষদিগকে নিষেধ করিলেন, আপনারা সৈন্য দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য করিবেন না।

সারজন ও তাঁহাদের সঙ্গী লোকদিগের কয়েদ হইবার সংবাদ সুপ্রীম কোর্টে পঁহুছিবা মাত্র জজেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রথমতঃ কোম্পানির উকীলকে, তুমি সংবাদ দিয়াছ, তাহাতেই আমাদের লোক সকল কয়েদ হইল, এই বলিয়া জেলখানায় পূরিয়া চাবি দিয়া রাখিলেন। পরিশেষে, গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের নামেও এই বলিয়া সমন করিলেন যে, আপনারা কাশীনাথ

বাবুর মোকদ্দমা উপলক্ষে, সুপ্রীম কোর্টের লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া, কোর্টের হুকুম অমান্য করিয়াছেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব স্পষ্ট উত্তর দিলেন, আমরা আপন পদের ক্ষমতা অনুসারে যে কর্ম্ম করিয়াছি, তদ্বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের হুকুম মান্য করিব না। এই ব্যাপার ১৭৮০ সালের মার্চ্চ মাসে ঘটে।

এই সময়ে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ ও স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সুপ্রীম কোর্টের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনায়, পার্লিমেণ্টে এই আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইয়া নূতন আইন জারী হইল। তাহাতে সুপ্রীম কোর্টের জজেরা সমুদয় দেশের উপর কর্তৃত্ব চালাইবার নিমিত্ত, যে ঔদ্ধত্য করিতেন, তাহা রহিত হইয়া গেল।

এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বেই, হেষ্টিংস সাহেব জজদিগের বদনে মধুদান করিয়া, সুপ্রীম কোর্টকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। তিনি চীফ জষ্টিস সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, মাসিক ৫০০০ টাকা বেতন দিয়া, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করিলেন, এবং আফিশের ভাড়ার নিমিত্ত মাসে ৬০০ টাকা দিতে লাগিলেন; আর, এক জন ছোট জজকে, চুঁচুড়ায় এক নূতন কর্ম্ম দিয়া, বড় মানুষ করিয়া দিলেন। ইহার পর কিছু কাল, সুপ্রীম কোর্টের কোনও অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেব, দেশীয় বিচারালয়ের অনেক সুধারা করিলেন; দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত, নানা জিলাতে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন

প্রবিন্সল কোর্টে কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার রাখিলেন। চীফ জষ্টিস, সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মে বসিয়া, জিলা আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কতকগুলি আইন প্রস্তুত করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে নব্বইটি আইন প্রস্তুত হয়। ঐ মূল অবলম্বন করিয়াই, কিয়ৎ কাল পরে, লার্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী আইন প্রস্তুত করেন।

সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবের সদর দেওয়ানীতে কর্ম্ম-প্রাপ্তির সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ বিষয় অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, হেষ্টিংস কেবল শান্তি রক্ষার্থেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। রাজমন্ত্রীরাও, সদর দেওয়ানী কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিলেন, এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সর গিলবর্ট এলিয়ট সাহেব তাঁহার অভিযোক্তা নিযুক্ত হইলেন। ইনিই, কিছু কাল পরে, লার্ড মিণ্টো নামে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়াছিলেন।

১৭৮০ সালের ১৯ এ জানুয়ারি, কলিকাতায় এক সংবাদপত্র প্রচার হইল। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে উহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

হেষ্টিংস সাহেব, ইহার পর চারি বৎসর, বাঙ্গালার কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, বারাণসী ও অযোধ্যার রাজ-কার্য্যের বন্দোবস্ত, মহীসূরের রাজা হৈদর আলির সহিত যুদ্ধ, ও ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে সন্ধি স্থাপন, ইত্যাদি

কার্য্যেই অধিকাংশ ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি অযোধ্যা ও বারাণসীতে যে সমস্ত ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে সমুদয় প্রচার হওয়াতে, ইংলণ্ডে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণের সকলের সম্মতি না হওয়াতে, তিনি স্বপদেই থাকিলেন। হেষ্টিংস, ১৭৮৪ সালের শেষ ভাগে আর এক বার অযোধ্যা যাত্রা করিলেন, এবং ১৭৮৫ সালের আরম্ভে, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আপন পদের উত্তরাধিকারী মেকফর্সন সাহেবের হস্তে ত্রেজরি ও কোর্ট উইলিয়মের চাবি সমর্পণ করিলেন এবং জাহাজে আরোহণ করিয়া জুন মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

১৭৮৪ সালে, এই দেশের পরম হিতকারী ক্লীবলণ্ড সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি, অতি অল্প বয়সে, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন। পঁহুছিবার পরেই, ভাগলপুর অঞ্চলের সমস্ত রাজকার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রদেশের দক্ষিণ অংশে এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার অধিত্যকাতে অসভ্য পুলিন্দজাতিরা বাস করিত। সন্নিকৃষ্ট জাতিরা সর্ব্বদাই তাহাদের উপর অত্যাচার করিত; তাহারাও, সময়ে সময়ে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অত্যাচারীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ক্লীবলণ্ড তাহাদের অবস্থার সংশোধন বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাহারা চিরসুখী হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল;

পার্ব্বতীয় অসভ্য পুলিন্দজাতিরাও সভ্য জাতির ন্যায় শান্তস্বভাব হইয়া উঠিল।

আবাদ না থাকাতে, ঐ প্রদেশের জল বায়ু অত্যন্ত পীড়াকর ছিল। তাহাতে ক্লীবলণ্ড সাহেব, শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া, স্বাস্থ্য লাভের প্রত্যাশায় সমুদ্র যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার ঊনত্রিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল। ডিরেক্টরেরা তদীয় সদ্গুণে এমন প্রীত ছিলেন যে, তাঁহার স্মরণার্থে এক সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। তিনি যে অসভ্য অকিঞ্চন পার্ব্বতীয়দিগকে সভ্য করিয়াছিলেন, তাহারাও অনুমতি লইয়া, তদীয় গুণগ্রামের চিরস্মরণীয়তা সম্পাদনার্থে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল। এতদ্দেশীয় লোকেরা, ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কোনও ইয়ুরোপীয়ের স্মরণার্থে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন নাই।

১৭৮৩ সালে, সর উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি বিদ্যানুশীলন দ্বারা স্বদেশে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, তিনি এতদ্দেশের আচার, ব্যবহার, পুরাবৃত্ত ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। তিনি এ দেশে আসিয়াই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পড়াইবার নিমিত্ত পণ্ডিত পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছজাতিকে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা অথবা শাস্ত্রীয় বিষয়ে উপদেশ দিতে সম্মত হইতেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর, এক জন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ

বৈদ্য, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে সম্মত হইলেন। সর উইলিয়ম জোন্স স্বল্প দিনেই উক্ত ভাষায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, অনায়াসে ইঙ্গরেজীতে শকুন্তলা নাটক ও মনুসংহিতার অনুবাদ করিতে পারিলেন।

তিনি, ১৭৮৪ সালে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি নামক এক সভা স্থাপন করিলেন। যে সকল লোক এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সোসাইটির মেম্বর হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সভার প্রথম অধিপতি হয়েন এবং প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে সভার সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সর উইলিয়ম জোন্সের তুল্য সর্ব্বগুণাকর ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত কেহ আইসেন নাই। তিনি, এতদ্দেশে দশ বৎসর বাস করিয়া, ঊনপঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পরলোক যাত্রা করেন।

১৭৮৩ সালে, কোম্পানির সমুদয় বিষয় কর্ম্ম পার্লিমেণ্টের গোচর হইলে, প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব ভারতবর্ষীয় রাজ্যশাসন বিষয়ে এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী স্বীকৃত হইলে, ভারতবর্ষে কোম্পানির কোনও সংস্রব থাকিত না। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন। উইলিয়ম পিট সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে

অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় রাজ্য-শাসনের এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী পার্লিমেণ্টে ও রাজসমীপে উভয়ত্রই স্বীকৃত হইল।

এ পর্য্যন্ত ডিরেক্টরেরাই এতদ্দেশীয় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; রাজমন্ত্রীরা কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু, ১৭৮৪ সালে, পিট সাহেবের প্রণালী প্রচলিত হইলে, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে এক সমাজ স্থাপিত হইল। রাজা স্বয়ং এই বোর্ডের সমুদয় মেম্বর নিযুক্ত করিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের হস্তার্পণের অধিকার হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

হেষ্টিংস সাহেব মেকফর্সন সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভার সমর্পণ করিয়া যান। ডিরেক্টরেরা, তদীয় প্রস্থান-সংবাদ শ্রবণ মাত্র, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে গবর্ণর জেনেরল ও কমাণ্ডর ইন চীফ উভয় পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কর্ণওয়ালিস পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের সন্তান, ঐশ্বর্য্যশালী ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এবং পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রধান প্রধান কর্ম্ম করিয়া, সকল বিষয়েই বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তিনি, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষে পঁহুছিলেন। যে সকল বিবাদ উপস্থিত থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেবের শাসন অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিসের নাম ও প্রবল প্রতাপে সে সমুদয়ের সত্বর নিষ্পত্তি হইল। তিনি সাত বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করিলেন; অনন্তর, মহীসুরের অধিপতি হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন; পরিশেষে, সুলতানের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজ্যের অনেক অংশ ও যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় লইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন।

লার্ড কর্ণওয়ালিস, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব বিষয়ে যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা দ্বারাই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে নিত্য নূতন বন্দোবস্ত করাতে, দেশের পক্ষে অনেক অপকার হইতেছে। তাঁহারা বোধ করিলেন, প্রীয়

ত্রিশ বৎসর হইল, আমরা দেওয়ানী পাইয়াছি, এত দিনে আমাদের ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা অবশ্যই ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, রাজা ও প্রজা উভয়েরই হানিকর না হয়, এমন কোনও দীর্ঘকালস্থায়ী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল, চির কালের নিমিত্ত একবিধ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে, গবর্ণমেণ্টে অদ্যাপি এ বিষয়ের কোনও নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় নাই; অতএব অগত্যা পূর্ব্বপ্রচলিত বার্ষিক বন্দোবস্তই আপাততঃ বজায় রাখিলেন।

ঐ সময়ে, তিনি কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, এই অভিপ্রায়ে, কালেক্টর সাহেবদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর লিখিবেন, তাহাতে ভূমির রাজস্ব বিষয়ে নিগূঢ় অনুসন্ধান পাইতে পারিবেন। তাঁহারা যে বিজ্ঞাপনী দিলেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, অতি অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু তৎকালে তদপেক্ষায় উত্তম পাইবার কোনও আশা ছিল না। অতএব কর্ণওয়ালিস, আপাততঃ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া, এই ঘোষণা করিলেন, যদি ডিরেক্টরেরা স্বীকার করেন, তবে ইহাই চিরস্থায়ী করা যাইবেক। অনন্তর বিখ্যাত সিবিল সরবেণ্ট জন শোর সাহেবের প্রতি রাজস্ব বিষয়ে এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। তিনি উক্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত ছিল না, তথাপি

তিনি উক্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দশশালা বন্দোবস্তে ইহাই নির্দ্ধারিত হইল, এ পর্য্যন্ত যে সকল জমীদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন, অতঃপর তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন। প্রজারা তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেক।

দেশীয় কর্ম্মচারীরা, রাজস্ব সংক্রান্ত প্রায় সমুদয় পুরাতন কাগজপত্র নষ্ট করিয়াছিল; যাহা অবশিষ্ট পাওয়া গেল, সমুদয় পরীক্ষা করিয়া, এবং ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসরে যাহা আদায় হইয়াছিল, তাহার গড় ধরিয়া কর নির্দ্ধারিত করা গেল। গবর্ণমেণ্ট ইহাও ঘোষণা করিয়া দিলেন, নিষ্কর ভূমির সহিত এ বন্দোবস্তের কোনও সম্পর্ক নাই, কিন্তু আদালতে ঐ সকল ভূমির দলীল পরীক্ষা করা যাইবেক, যে সকল ভূমির দলীল অকৃত্রিম হইবেক, সে সমুদয় বাহাল থাকিবেক; আর কৃত্রিম বোধ হইলে, তাহা বাতিল করিয়া, ভূমি সকল বাজেয়াপ্ত করা যাইবেক। এই সমুদয় প্রণালী ডিরেক্টরদিগের সমক্ষে সমর্পিত হইলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং ঐ বন্দোবস্তই নির্দ্ধারিত ও চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, কর্ণওয়ালিস সাহেবকে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ্চ, এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল যে, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব ৩১০৯৫০ টাকা, ও বারাণসীর রাজস্ব ৪০০০৬১৫ টাকা, চির কালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে, বাঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এরূপ না হইয়া, যদি পূর্ব্বের ন্যায় রাজস্ব বিষয়ে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, এ দেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই অমঙ্গল ঘটিয়াছে; প্রথম এই যে, ভূমি ও ভূমির মূল্য নিশ্চিত না জানিয়া, বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; তাহাতে কোনও কোনও ভূমিতে অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও ভূমিতে অতি সামান্য, কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে; দ্বিতীয় এই যে, সমুদয় ভূমি যখন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা আবাদ করিয়া চির কাল ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল, নূতন ভূম্যধিকারীদিগের স্বেচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিত্রাণের কোনও বিশিষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

১৭৯৩ সালে, বাঙ্গালার শাসন নিমিত্ত আইন প্রস্তুত হয়। যখন যে যে আইন প্রচলিত করা গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিস সে সমুদয় একত্র সঙ্কলন করিলেন, এবং সংশোধন ও অনেক নূতন আইন যোগ করিয়া দিয়া, তাহা এক গ্রন্থের ন্যায় প্রচার করিলেন। ইহাই অনন্তর-জাত যাবতীয় আইনের মূলস্বরূপ। ১৭৯৩ সালের আইন সকল এরূপ সহজ ও তাহাতে এরূপ গুণপণা প্রকাশ হইয়াছে যে তৎপ্রণেতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। ঐ সমুদয় আইন দেশীয় কতিপয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

ফরষ্টর্ সাহেব তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন; তিনি ঐ সমুদয় আইন বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। এই সাহেব, কিঞ্চিৎ কাল পরে, বাঙ্গালা ভাষার

সর্ব্বপ্রথম এক অভিধান প্রস্তুত করেন। পারসী ভাষায় সবিশেষ নিপুণ এডমনষ্টন সাহেব ঐ ভাষাতে আইন তরজমা করেন। এই অনুবাদ এমন উত্তম হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। এই সমুদয় আইন অনুসারে বিচারালয়ে যে সকল প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। পরে দেশীয় লোকদিগকে বিচার সম্পর্কীয় উচ্চ পদ প্রদান করা নির্দ্ধারিত হওয়াতে তাহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত হয়।

লার্ড কর্ণওয়ালিস বিচারালয়ে পাঁচ সোপান স্থাপন করেন। প্রথম, মুন্সেফ ও সদর আমীন; দ্বিতীয়, রেজিষ্টর; তৃতীয়, জিলা জজ; চতুর্থ, প্রবিন্সল কোর্ট; পঞ্চম, সদর দেওয়ানী আদালত। তিনি এই অভিপ্রায়ে সমুদয় সিবিল সরবেণ্টদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, আর তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণের লোভ করিবেন না। কিন্তু বিচারালয়ের দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন পূর্ব্ববৎ অতি সামান্যই রহিল। উচ্চপদাভিষিক্ত ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারিরা পূর্ব্বে কয় শত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা অনেক সহস্র টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেশীয় লোকেরা বড় বড় বেতন পাইয়া আসিয়াছিলেন। ফৌজদার বৎসরে ষাটি সত্তর হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। এক এক সুবার নায়েব দেওয়ান, বার্ষিক নয় লক্ষ টাকার ন্যূন বেতন পাইতেন না। কিন্তু, ১৭৯৩ সালে, দেশীয় লোকদিগের অত্যুচ্চ বেতন এক শত টাকার অধিক ছিল না।

লার্ড কর্ণওয়ালিস রাজ্যশাসন দূঢ়ীভূত করিয়াছেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল করিয়াছেন। দেশীয়লোকেরা তাঁহার দয়ালুতা ও বিজ্ঞতার নিমিত্ত যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অপাত্রে বিন্যস্ত হয় না। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার অসাধারণগুণদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ইণ্ডিয়া হৌসে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন, এবং ভারতবর্ষ পরিত্যাগদিবস অবধি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

২৮এ অক্টোবর, সর জন শোর্ সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রগাঢ় বিবেচনাশক্তি দ্বারা বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দশশালা বন্দোবস্তের সময়, তিনি রাজস্ব বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলেখ্যে এমন প্রগাঢ় বিদ্যা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শিত হয় যে, উহা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তদ্দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হন এবং ডিরেক্টরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করেন যে, লার্ড কর্ণওয়ালিসের পরে ইঁহাকেই গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিতে হইবেক।

তাঁহার নিয়োগের পর বৎসর, অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাবান্ সুপ্রীম কোর্টের অপক্ষপাতী জজ, সর উইলিয়ম জোন্স, আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, কালগ্রাসে পতিত হন।

সর জন সোর সাহেবের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল। শোর সাহেব তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া এক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত করেন।

১৭৯৫ সালে, নবাব মুবারিক উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র নাজির উলমুলুক মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু তৎকালে মুরশিদাবাদের নবাব নিযুক্ত করা অতি সামান্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব, এই মাত্র কহিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক, পিতা যেরূপ মাসহারা পাইতেন, পুত্রও সেইরূপ পাইতে লাগিলেন।

সর জন শোর সাহেব, নির্ব্বিরোধে পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া, কর্ম্ম পরিত্যাগের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকারকালে বাঙ্গালা দেশে লিখনোপযুক্ত কোনও ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু তদীয় শাসন কাল শেষ হইবার সময়ে, এক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইল। সৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন দর্শাইতে লাগিল। ঐ সময়ে, মহীসূরের অধিপতি টিপু সুলতান, সৈন্য দ্বারা আনুকূল্য পাইবার আশয়ে, ফরাসিদিগকে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গত যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে যেরূপ খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি এক নিমিষের নিমিত্তও ভুলিতে পারেন নাই; অহোরাত্র কেবল বৈরনির্য্যাতনের উপায় চিন্তা করিতেন। তিনি এমন আশা করিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য লইয়া, ইঙ্গরেজদিগকে এক বারে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিবেন। ডিরেক্টরেরা, এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, এমন সময়ে কোনও বিচক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোককে গবর্ণর জেনেরলের পদে

নিযুক্ত করিয়া পাঠান উচিত। অনন্তর, তাঁহারা লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষের রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন, এবং তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কিন্তু আসিবার সমুদয় আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি আয়র্লণ্ডে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিরেক্টরেরা বিলম্ব না করিয়া, লার্ড ওয়েলেসলিকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইঁহারই নামান্তর লার্ড মর্নিঙ্গটন। এই লার্ড বাহাদুর লার্ড কর্ণ-ওয়ালিস মহোদয়ের ভ্রাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং সবিশেষ অনুরাগ ও পরিশ্রম সহকারে ভারতবর্ষীয় রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি, ১৭৯৮ সালের ১৮ই মে, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। গোলযোগের সময়ে, যেরূপ দূরদৃষ্টি, পরাক্রম, ও বিজ্ঞতাসহকারে কার্য্য করা আবশ্যক, সে সমুদায়ই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবা মাত্র, ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যবিষয়ক সমুদায় আশঙ্কা এক বারে অন্তর্হিত হইল।

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, টাকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; সৈন্য সকল একে অকর্ম্মণ্য, তাহাতে আবার অসন্তুষ্ট হইয়া আছে; উত্তরে সিন্ধিয়া, দক্ষিণে টিপু সুলতান, পূর্ণ শক্র হইয়া বিভীষিকা দর্শাইতেছেন; ফরাসি-দিগের দিন দিন ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। তিনি অতি ত্বরায় সৈন্য সকল সম্যক কর্ম্মণ্য করিয়া তুলি-লেন; যে সকল ফরাসি সেনাপতি, বহুতর সৈন্য সহিত, হায়দ্রাবাদে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে দূর করিয়া

দিলেন; আর, তাঁহারা যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া দিলেন। তাহাদের পরিবর্ত্তে, সেই সেই স্থানে ইঙ্গরেজী সেনা স্থাপিত করিলেন, এবং এক বারেই টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। সমুদয় শত্রু মধ্যে তিনিই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের কৌন্সিলের সাহেবেরা লার্ড ওয়েলেসলির মতের পোষকতা না করিয়া, বরং তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। তিনি, অবিলম্বে মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বয়ং সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং সত্বর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ২৭ এ মার্চ্চ টিপু সুলতানের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন, মে মাসের চতুর্থ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে টিপু প্রাণত্যাগ করিলেন। হায়দরপরিবারের রাজ্যাধিকার শেষ হইল। ডিরেক্টরেরা, এই সংগ্রামের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকার পেনশন প্রদান করিলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি, সিবিল সরবেণ্টদিগকে দেশীয় ভাষায় নিতান্ত অজ্ঞ দেখিয়া, ১৮০০ খৃঃ অব্দে, কলিকাতায় কালেজ আব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সিবিলেরা ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পঁহুছিলে, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। তাঁহারা যাবৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতেন, তাবৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে বাঙ্গালা

প্রভৃতি ভাষাতে কতিপয় পুস্তক সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এই বিদ্যালয় সংস্থাপনের সংবাদ ডিরেক্টরদিগের নিকট পঁহুছিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে বলিয়া, সকল বিষয়ের সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরকে সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই দুই পরাক্রান্ত রাজা অল্প দিনেই পরাজিত ও খর্ব্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অনেক অংশ ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। সেপ্টেম্বর মাসে, ইঙ্গরেজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর প্রথম অধিকার করিলেন। পূর্ব্বে, মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীশ্বরের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুশক্তি রহিল না। তিনি কেবল বার্ষিক পনর লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন।

সেই সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুর অবিলম্বে উড়িষ্যায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দে, সেপ্টেম্বরের অষ্টাদশ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল। তদবধি সমুদয় উড়িষ্যা দেশ পুনরায় বাঙ্গালারাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে, আলিবর্দ্দি খাঁ, আপন অধিকারের শেষ বৎসরে, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে এই দেশ সমর্পণ করেন। ইঙ্গরেজেরা, পুরীর পুরোহিতদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়া ও

সমাদর প্রদর্শন করিলেন, এবং পুরী সংক্রান্ত আর ব্যয় প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগকে আপন বিবেচনা অনুসারে সমাধা করিতে কহিলেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে ইঙ্গরেজেরা, কর বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, মন্দিরের অধ্যক্ষতা গ্রহণ, ও নিজের লোক দিয়া কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ, করিলেন। ঐ সংগৃহীত ধনের কিয়দংশ মাত্র দেবসেবায় নিয়োজিত হইত, অবশিষ্ট সমুদয় কোম্পানির ধনাগারে প্রবেশ করিত।

বহু কাল অবধি ব্যবহার ছিল, পিতা মাতা, গঙ্গাসাগরে গিয়া, সাগরজলে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা এই কর্ম্ম ধর্ম্মবোধে করিতেন বটে; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার কোনও বিধি নাই। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, এই নৃশংস ব্যবহার এক বারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, ১৮০২ সালের ২০ এ আগষ্ট, এক আইন জারী করিলেন, ও তাহার পোষকতা নিমিত্ত, গঙ্গাসাগরে এক দল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই নৃশংস ব্যবহার এক বারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

লার্ড ওয়েলেসলি এই মহারাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করেন এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া পনর কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা স্থির করেন। কিন্তু, তিনি নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাতে, রাজস্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঋণেরও বৃদ্ধি হইয়া ছিল। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার এরূপ যুদ্ধবিষয়ক অনুরাগ দর্শনে, যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং যাহাতে শান্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজ্যশাসন হয়, এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন, আর তাঁহার উপর ডিরেক্টরদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। এজন্য, তিনি, তাঁহাদের লিখিত পত্রের উত্তর লিখিয়া, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, এবং ১৮০৫ খৃঃ অব্দের শেষে, ইংলণ্ড গমনার্থ জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ডিরেক্টরেরা, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শান্তি স্থাপন ও ব্যয় লাঘব করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং জাহাজে আরোহণ করিয়া ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৩০এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, কালবিলম্ব না করিয়া, ভারতবর্ষীয় ভূপতিদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত, পশ্চিম অঞ্চল প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিম অভিমুখে যত গমন করিতে লাগিলেন, ততই শারীরিক দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন; পরিশেষে গাজীপুরে উপস্থিত হইয়া, ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, তাঁহার উপর আপনাদের অনুরাগ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহার পুত্রকে চারি লক্ষ টাকা উপহার দিলেন।

কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর জর্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু রাজমন্ত্রীরা কহিলেন, এই পদে লোক নিযুক্ত করা আমাদের অধিকার। এই বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে, লার্ড

মিণ্টোকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করাতে, সে সমুদয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। সর জর্জ বার্লো সাহেবের অধিকার কালে, গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রযাত্রীদিগের নিকট মাসুল আদায়ের ও মন্দিরের অধ্যক্ষতার ভার স্বহস্তে আনিয়াছিলেন। যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত নানা উপায় করা হইয়াছিল। ইহাতে অনেক রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। তৎকালে এই যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, উহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক প্রবল থাকে।

লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ৩১ এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, ১৮১৩ খৃঃ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত, রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে, বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্যের কোনও বিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই; কেবল পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়ে পূর্ব্ব অপেক্ষা কঠিন নিয়মে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব, ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, এই নিয়ম রহিত করিয়া যান; পরে ১৮০১ খৃঃ অব্দে, পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়। এই রূপে রাজস্বের বৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু বাণিজ্যের বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিতে, ও প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতে লাগিল।

১৮১০ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা, ফরাসিদিগকে পরাজয় করিয়া, বুর্ব্বো ও মরিশস নামক দুই উপদ্বীপ অধিকার করিলেন, এবং তৎপর বৎসর, ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া, জাবা নামক সমৃদ্ধ উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুর যে চার্টর অর্থাৎ সনন্দ লইয়াছিলেন, তাহার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে,

১৮১৩ খৃঃ অব্দে, নূতন চার্টর গৃহীত হইল। এই উপলক্ষে এতদ্দেশীয় রাজকার্য্য সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়মের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। দুই শত বৎসরের অধিক কাল অবধি, ইংলণ্ডের মধ্যে কেবল কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বরের বাণিজ্য করা উচিত নহে, এই বিবেচনায়, নূতন বন্দোবস্তের সময়, কোম্পানি বাহাদুরের কেবল রাজ্যশাসনের ভার রহিল, আর, অন্যান্য বণিকদিগের বাণিজ্যে অধিকার হইল। পূর্ব্বে, কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্যান্য ইয়ুরোপীয়দিগকে, ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে, যে ক্লেশ পাইতে হইত, তাহা এক বারে নিবারিত হইল। এক্ষণে, ডিরেক্টরেরা যাহাদিগকে অনুমতি দিতে চাহিতেন না, তাহারা বোর্ড আব কণ্ট্রোল নামক সভাতে আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে লাগিল।

১৮১৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবরে, লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, লার্ড ময়রা বাহাদুরের হস্তে ভারতবর্ষীয় রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; কিন্তু আপন আলয়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরিশেষে, লার্ড ময়রা বাহাদুরের নাম মারকুইস অব হেষ্টিংস হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

লার্ড হেষ্টিংস গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, নেপালীদেরা ক্রমে ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। সিংহাসনারূঢ় রাজপরিবার, এক শত বৎসরের মধ্যে, নেপালে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লার্ড মিণ্টো বাহাদুরের অধিকার কালে নানা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। লার্ড হেষ্টিংস দেখিলেন, নেপালাধিপতির সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রথমতঃ সন্ধি রক্ষার্থে যথোচিত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নেপালেশ্বরের অসহনীয় প্রগল্ভতা দর্শনে, পরিশেষে, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথম বর্ষে কোনও ফলোদয় হইল না; কিন্তু ১৮১৫ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি অক্টরলোনি বাহাদুর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। তখন, আপন রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ পণ দিয়া, নেপালাধিপতিকে সন্ধি ক্রয় করিতে হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে পিণ্ডারী নাম এক দল বহুসংখ্যক অশ্বারোহ দস্যু বাস করিত। অনেক বৎসর অবধি, ঐ অঞ্চলের সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করা তাহাদের ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ অঞ্চলের অনেক রাজা তাহাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেন। তাহারা পাঁচ শত ক্রোশের

অধিক দেশ ব্যাপিয়া লুঠ করিত। তাহাদের নিবারণের নিমিত্ত, ইঙ্গরেজদিগকে এক দল সৈন্য রাখিতে হইয়াছিল। তাহাতে প্রতি বৎসর যে খরচ পড়িতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত অধিক বোধ হওয়াতে, পরিশেষে ইহাই যুক্তিযুক্ত ও পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল যে, সর্ব্বদা এরূপ করা অপেক্ষা, এক বার এক মহোদ্যোগ করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা উচিত।

অনন্তর, লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, ডিরেক্টর সমাজের অনুমতি লইয়া, তিন রাজধানী হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সংগৃহীত সৈন্য, এই দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের বাসস্থান রোধ করিয়া, একে একে তাহাদের সকল দলকেই উচ্ছিন্ন করিল।

ইঙ্গরেজদের সেনা, পিণ্ডারীদিগের সহিত সংসক্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে পেশোয়া, হোল্‌কার, ও নাগপুরের রাজা ইঁহারা সকলে এক কালে, একপরামর্শ হইয়া, এই আশয়ে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন যে, সকলেই একবিধ যত্ন করিলে, ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পরাজিত হইলেন। নাগপুরের রাজা ও পেশোয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইঙ্গরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ কালে, লার্ড হেষ্টিংসের পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম; তথাপি, তাদৃশ গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা ও উৎসাহের আবশ্যকতা, তাহা তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পিণ্ডারী

ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম এক বারে লুপ্ত হইল, এবং ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন।

লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্ব্বে, প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানকূপে পতিত থাকিলে, কোনও কালে রাজ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্ব্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা, প্রজাদের মঙ্গলের নিমিত্তই, ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপন করিয়াছেন; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজার সভ্যতা সম্পাদন করা ইঙ্গরেজজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮২৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি, নয় বৎসর কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, কোম্পানির রাজ্য ও রাজস্বের বিলক্ষণ বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধ করেন। ইহার পূর্ব্বে, ইঙ্গরেজদিগের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের এমন সমৃদ্ধি কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং সমুদয় ব্যয় সমাধা করিয়াও, বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন রাজমন্ত্রী জর্জ ক্যানিঙ ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তিনিই গবর্ণর জেনেরলের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

তাঁহার আসিবার সমুদয় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে

অন্ত এক জন রাজমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, ইংলণ্ডে এক অতি প্রধান পদ শূন্য হইল এবং ঐ পদে তিনিই নিযুক্ত হইলেন। তখন ডিরেক্টরেরা লর্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরকে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এই মহোদয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া, চীনের রাজধানী পেকিন নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি, ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রস্থান অবধি, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরের উপস্থিতি পর্য্যন্ত কয়েক মাস কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর জন আদম সাহেব গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার অধিকার কালে, বিশেষ কার্য্যের মধ্যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইয়াছিল।

লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর কলিকাতায় পঁহুছিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মদেশীয়েরা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইঙ্গরেজেরা যে সময়ে বাঙ্গালা অধিকার করেন, ব্রহ্ম দেশের তৎকালীন রাজাও, প্রায় সেই সময়েই, তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মণিপুর ও আসাম অনায়াসে জয় করেন এবং সেই গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশও জয় করিবেন। তিনি, ইঙ্গরেজদের সহিত সন্ধি সত্ত্বেও, উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত কাচার ও আরাকান দেশে স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করেন। আরাকান উপকূলে, টিকনাফ নদীর শিরোভাগে, শাপুরী নামে যে দ্বীপ আছে, ব্রহ্মেশ্বর তাহা আক্রমণ করিয়া, তথায়

ইঙ্গরেজদিগের যে অল্পসংখ্যক রক্ষক ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রাণবধ করেন। আবার দূত প্রেরণ করিয়া এরূপ অনুষ্ঠানের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত বাক্যে এই উত্তর দেন, ঐ উপদ্বীপ আমার অধিকারে থাকিবেক, ইহার অন্যথা হইলে, আমি বাঙ্গালা আক্রমণ করিব।

এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৬ই মে, ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইঙ্গরেজেরা, ১১ই মে, ব্রহ্মরাজ্যে সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া, রেঙ্গুনের বন্দর অধিকার করিলেন। তৎপরেই, আসাম, আরাকান ও মরগুই নামক উপকূল তাঁহাদের হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজদিগের সেনা ক্রমে ক্রমে আবা রাজধানী অভিমুখে গমন করিল এবং প্রয়াণকালে বহুতর গ্রাম নগর অধিকার পূর্ব্বক, ব্রহ্মরাজের সেনাদিগকে পদে পদে পরাজিত করিতে লাগিল। ১৮২৬ খৃ অব্দের আরম্ভে ইঙ্গরেজদিগের সেনা অমর পুরের অত্যন্ত প্রত্যাসন্ন হইলে, রাজা, নিজ রাজধানী রক্ষার্থে, ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত পণেই সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর, এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; ঐ সন্ধিপত্র যান্দাবু সন্ধিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। তদ্দ্বারা ব্রহ্মাধিপতি ইঙ্গরেজদিগকে মণিপুর, আসাম, আরাকান ও সমুদয় মার্ত্তাবান উপকূল প্রদান করিলেন, এবং যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিবার নিমিত্ত এক কোটি টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

যৎকালে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, ঐ সময়ে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জ্জনশালের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি, আপন ভ্রাতা মাধু সিংহের সহিত

পরামর্শ করিয়া, নিজ পিতৃব্যপুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার বলবন্ত সিংহের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। সর চার্লস মেটকাফ সাহেব দুর্জ্জনশালকে বুঝাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তখন স্পষ্ট বোধ হইল, শস্ত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক না। বিশেষতঃ, এই স্থান অধিকার করা ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি লার্ড লেক ঐ স্থান অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অধিক সেনা ও সেনাপতির প্রাণবিনাশ হয়। ইঙ্গরেজেরা এ পর্য্যন্ত যত দুর্গ অবরোধ করেন, তন্মধ্যে কেবল ভরতপুরের দুর্গই অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে সমুদয় ভারতবর্ষ মধ্যে এই জনরব হইয়াছিল, ইঙ্গরেজেরা এই দুর্গ কখনই অধিকার করিতে পারিবেন না। উহার চতুর্দ্দিকে অতি প্রশস্ত মৃণ্ময় প্রাচীরের পাদদেশে এক বৃহৎ পরিখা ছিল।

তৎকালে অনেক সৈন্য ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও বিংশতি সহস্র সৈন্য ও এক শত কামান ভরতপুরের সম্মুখে অবিলম্বে নীত হইল। ভারতবর্ষীয় সমুদায় লোক প্রগাঢ় ঔৎসুক্য সহকারে, এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩ এ ডিসেম্বর, যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ১৮২৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লার্ড কম্বরমীর বাহাদুর ঐ স্থান অধিকার করিলেন। দুর্জ্জনশাল ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে এলাহাবাদের দুর্গে প্রেরণ করিলেন।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, পশ্চিম অঞ্চল

যাত্রা করিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহের সহিত কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য বিষয়ে কথোপকথন উপস্থিত হওয়াতে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা আর এখন তৈমুরবংশীয়দিগের অধীন নহেন; রাজসিংহাসন এক্ষণে তাঁহাদের হইয়াছে। দিল্লীর রাজপরিবার, এই কথা শ্রবণ করিয়া, বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট অশেষ প্রকারে অবমানিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদসাহনামের অন্যথা হয় নাই; এক্ষণে রাজ্যাধিকার চিরকালের নিমিত্ত হস্তবহির্ভূত হইল। ইঙ্গরেজদের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষবাসী সমুদয় লোক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুর, উইলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলি সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভার সমর্পণ করিয়া, ১৮২৮ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, ইংলণ্ড গমন করিলেন। তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক উক্ত পদের নিমিত্ত ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, কোনও কারণ বশতঃ উদ্ধত হইয়া, অন্যায় করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক্ষণে তাঁহারা, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, ১৮২৭ সালে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, তৎকালে ইংলণ্ডে এই প্রধান পদের নিমিত্ত তত্তুল্য উপযুক্ত ব্যক্তি অতি অল্প পাওয়া যাইত।

লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর, ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে, লার্ড হেষ্টিংসের অধিকার কালে, ভারতবর্ষের ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু এই সময়ে তাহা এক বারে শূন্য হইয়াছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিঃসন্দেহ ব্যয় লাঘব করিব। তিনি কলিকাতায় পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই, রাজস্ব বিষয়ে দুই কমিটি স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের উপর এই ভার হইল যে, সিবিল ও মিলিটারি সম্পর্কে যে ব্যয় হইয়া থাকে তাহার পরীক্ষা করিবেন, এবং তন্মধ্যে কি কমান যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

তাঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে সমুদয় কর্ম্মস্থানে ব্যয় লাঘব করা গেল। এরূপ কর্ম্ম করিলে, কাজে কাজেই, সকলের অপ্রিয় হইতে হয়। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ব্যয় লাঘব করিয়া, কোর্টের যে আদেশ প্রতিপালন করিলেন, তাহাতে যাঁহাদের ক্ষতি হইল, তাহারা তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়াছিল। ফলতঃ, যে রাজকর্ম্মচারীকে রাজ্যের ব্যয় লাঘব করিবার ভার গ্রহণ করিতে হয়, তিনি কখনই তদানীন্তন লোকের নিকট সুখ্যাতি প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া চারি দিকে কোলাহল আরম্ভ করিল। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত না হইয়া, কেবল ব্যয় লাঘব ও ঋণ পরিশোধের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অনেক বৎসর অবধি, গবর্ণমেণ্ট সহগমন নিবারণার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং কত স্ত্রী সহমৃতা হয় ও

এশ্বরের নিকট দরখাস্ত দিবার নিমিত্ত, এক জন ইঙ্গরেজ উকীলকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তথাকার রাজমন্ত্রীরা, সহগমনের অনুকূল যুক্তি সকল শ্রবণ করিয়া, পরিশেষে নিবারণ পক্ষই দৃঢ় করিলেন। বহু কাল অতীত হইল, সহমরণ রহিত হইয়াছে; এই দীর্ঘ কাল মধ্যে, প্রজাদিগের অসন্তোষের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ, এক্ষণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি ইহা ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত না থাকে, তবে উত্তরকালীন লোকেরা, এরূপ নৃশংস ব্যবহার কোনও কালে প্রচলিত ছিল ইহা প্রায় প্রত্যয় করিবেক না।

১৮৩১ সালে, বিচারালয়ের অনেক রীতির পরিবর্ত্ত হইতে আরম্ভ হইল। বাঙ্গালিরা এ পর্য্যন্ত, অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিতেন। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক দেশীয় লোক দিগের মান সম্ভ্রম বাড়াইবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে উচ্চ বেতনে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে মনন করিলেন। এই বৎসরে মুন্সেফ ও সদর আমীনদিগের বেতন ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হইল; এবং উচ্চতর বেতনে অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান সদর আমীনীপদ নূতন সংস্থাপিত হইল। দেওয়ানী বিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা হইল। রেজিষ্টরের পদ ও প্রবিন্সল কোর্ট উঠিয়া গেল; কেবল দেশীয় বিচারকের ও জিলা-জজের আদালত এবং সদরদেওয়ানী আদালত বজায় থাকিল। ফলিতার্থ এই যে, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তিকরণের ভার দেশীয় বিচারকদিগের প্রতি

নবম অধ্যায়।

দেশীয় লোকদিগেরই বা, তদ্বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায়, নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, অনেক অনুসন্ধানও হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অনেকেই কহিয়াছিলেন, দেশীয় লোকদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ আছে, ইহা রহিত করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, এই বিষয় বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ইহা অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে। কৌন্সিলের সমুদয় সাহেবেরা তাঁহার মতে সম্মত হইলেন। তদনন্তর, ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, এক আইন জারী হইল, তদনুসারে ইঙ্গরেজদিগের অধিকার মধ্যে এই নৃশংস ব্যাপার একে বারে রহিত হইয়া গেল।

কতকগুলি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি, এই হিতানুষ্ঠানকে অহিত জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট এই প্রার্থনায় আবেদন করিলেন যে, ঐ আইন রদ করা যায়। লার্ড উইলিয়ম, এই ধর্ম্ম রহিত করিবার বহুবিধ প্রবল যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। সেই সময়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি আর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম এই, আমরা শ্রীযুতের এই দয়ার কার্য্যে অনুগৃহীত হইয়া ধন্যবাদ করিতেছি।

যাঁহারা সহগমনের পক্ষ ছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে কলিকাতায় এক ধর্ম্মসভা স্থাপন ও চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন; এবং, এই বিধি পুনঃ স্থাপিত হয় এই প্রার্থনায়,

অর্পিত হইল; আর, ইঙ্গরেজ জজদিগের উপর কেবল আপীল শুনিবার ভার রহিল।)

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ফৌজদারী আদালতেও অনেক সুরীতি স্থাপন করেন। পূর্ব্বে, দায়রায় সাহেবেরা ছয় মাসে এক বার আদালত করিতেন; কিয়ৎ কাল পরে কমিসনর সাহেবেরা তিন মাসে এক বার। এক্ষণে এই হুকুম হইল, সিবিল ও সেসন জজেরা প্রতি মাসে এক এক বার বৈঠক করিবেন। কয়েদী আসামী ও সাক্ষীদিগকে যে অধিক দিন ক্লেশ পাইতে হইত, তাহার অনেক নিবারণ হইল। ফলতঃ, কার্য্যদক্ষ লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকারকালে যে নানা সুনিয়ম সংস্থাপিত হয়, সে সমুদয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য এই, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়ে ও সুশৃঙ্খল রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে, রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি, এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে, দেব দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া, বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, অশেষ প্রকারে যত্নবান হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। রামমোহন রায় এ দেশের এক জন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন সন্দেহ

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরের অধিকার কালে, তৈমুরবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য নিবন্ধন প্রাধান্য রহিত হয়। সম্রাট, অপহারিত মর্য্যাদার উদ্ধার বাসনায়, ইংলণ্ডে আপীল করিবার নিশ্চয় করিয়া, রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্থির করিলেন। পূর্ব্বকালে সমুদ্রযাত্রা স্বীকারে ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা ও অধর্ম্ম হইত না; ইদানীন্তন সময়ে কোনও ব্যক্তি জাহাজে গমন করিলে, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় অসঙ্কুচিত চিত্তে, জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক, ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, যার পর নাই সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই যাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডেশ্বর ত্রিশ বৎসরের অনুগ্রহদত্ত বৃত্তিভোগী তৈমুরবংশীয়দিগের আধিপত্যের পুনঃস্থাপন বিষয়ে, সম্মত হইলেন না। কিন্তু তাঁহাদের যে বৃত্তি নিরূপিত ছিল, রামমোহন রায় তাহার আর তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই, দেহযাত্রা সংবরণ পূর্ব্বক, ব্রিষ্টল নগরের সন্নিকৃষ্ট সমাধিক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছেন।

১৮৩২ সাল অতিশয় দুর্ঘটনার বৎসর। যে সকল সওদাগরের কৌস ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর চলিয়া আসিতেছিল, এই বৎসরে সে সকল দেউলিয়া হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে পামর কোম্পানির কৌস, ১৮৩০ সালে, দেউলিয়া হয়। আর পাঁচটার তৎপরে তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম চলিয়াছিল; পরিশেষে তাহারাও দেউলিয়া হইল। এই ব্যাপার ঘটাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের যো

ক্ষতি হয়। তন্মধ্যে দেউলিয়াদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে, দুই কোটি টাকাও আদায় হয় নাই।

পূর্ব্ব মিয়াদ অতীত হইলে, ১৮৩৩ সালে, কোম্পানি বাহাদুর পুনর্ব্বার, বিংশতি বৎসরের নিমিত্ত, সনন্দ পাইলেন। এই উপলক্ষে, এতদ্দেশীয় রাজ্যশাসনের অনেক নিয়ম পরিবর্ত্ত হইল। কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ, ও সমুদায় কুঠী বিক্রয় করিতে হইল। তৎপূর্ব্ব বিশ বৎসর, চীনদেশীয় বাণিজ্যই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, এক্ষণে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল। ফলতঃ, দুই শত তেত্রিশ বৎসরের পর্য্যন্ত তাঁহারা যে বণিগ্বৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে এক বারে নিঃসম্বন্ধ হইয়া, রাজ্যশাসন কার্য্যেই ব্যাপৃত হইতে হইল। কলিকাতায় এক বিধিদায়িনী সভা স্থাপনের অনুমতি হইল। এই নিয়ম হইল, তাহাতে কৌন্সিলের নিয়মিত মেম্বরেরা, ও কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিন্ন আর এক জন মেম্বর, বৈঠক করিবেন। এই নূতন সভার কর্ত্তব্য এই নির্দ্ধারিত হইল, যখন যেরূপ আবশ্যক হইবেক, ভারতবর্ষে তখন তদনুরূপ আইন প্রচলিত করিবেন, এবং সুপ্রীম কোর্টের উপর কর্ত্তৃত্ব ও তথাকার বন্দোবস্ত করিবেন। আর, সমুদয় দেশের জন্য আইন পুস্তক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লা কমিসন নামে এক সভা স্থাপিত হইল। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সমুদয় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান অধিপতি হইলেন; অন্যান্য রাজধানী তাঁহার অধীন হইল। বাঙ্গালার রাজধানী বিভক্ত হইয়া, কলিকাতা ও আগরা, দুই স্বতন্ত্র রাজধানী হইল।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, প্রজাগণের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হইয়া, ইঙ্গরেজীশিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৮১৩ সালে, পার্লিমেণ্টের অনুমতি হয়, প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবে। এই টাকার প্রায় সমুদয়ই সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যার অনুশীলনে ব্যয়িত হইত। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনে তদপেক্ষা অধিক উপকার বিবেচনা করিয়া, উক্ত উভয় বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ ও স্থানে স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিলেন। তদবধি, এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী ভাষার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, দেশীয় লোকদিগকে ইয়ুরোপীয় আয়ুর্বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, কলিকাতায় মেডিকেল কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, দেশের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসায় নিপুণ হইবার নিমিত্ত, ছাত্রদিগের যে যে বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক, সে সমুদয়ের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

সকল ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের অধিকার সময়ে সেবিংস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। যদর্থে উহা স্থাপিত হয়, সম্পূর্ণ রূপে তাহার ফল দর্শিয়াছে।

লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়েও মনোযোগ দিয়াছিলেন। বহু কাল অবধি এই রীতি ছিল, দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কোনও দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে মাসুল দিতে হইত; তদনুসারে, কি জলপথ কি

উইলিয়ম বেণ্টিক, আপন অধিকারের প্রারম্ভ হইতে, এতদ্দেশে সমুদ্রে ও নদ নদী মধ্যে বাষ্পনাবিককর্ম্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সংবাদ মাসে মাসে উভয়ত্র পঁহুছিতে পারে, তিনি সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডিরেক্টরেরা এ বিষয়ে বিস্তর বাধা দিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত পুলিন্দা লইয়া যাইবার নিমিত্ত, বাষ্পনৌকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। যাহা হউক, লার্ড বেণ্টিক বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলের নদ নদীতে লৌহনির্ম্মিত বাষ্পজাহাজ চালাইবার প্রণালী বিষয়ে তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন। এই বিষয়, ইয়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে, বিলক্ষণ উপকারক হইয়াছে।

১৮৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকার সমাপ্ত হয়। তাঁহার অধিকার কালে, ভিন্নদেশীয় নরপতিগণের সহিত যুদ্ধ নিবন্ধন কোনও উদ্বেগ ছিল না। এক দিবসের জন্যেও, সন্ধি ও শান্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাঁহার অধিকার কাল কেবল প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS, 62, AMHERST STREET.
1883.

নবম অধ্যায়।

স্থলপথ, সর্ব্বত্র এক এক পরমিটের ঘর স্থাপিত হয়। দ্রব্য সকল আটকাইয়া তদারক করিবার নিমিত্ত, অ' কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। মাস্তুলঘরে নিযুক্ত কর্ম্মচারী যে স্থা। গবর্ণমেণ্টের মাস্তুল এক টাকা আদায় করিত, সেখানে আপনারা নিজে অন্ততঃ দুই টাকা লইত। ফলতঃ, তাহ প্রজার উপর এমন দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল যে, এ বিষয়ে অধিকৃত এক জন বিচক্ষণ ইয়ুরোপীয়, যথার্থ বিবেচনা পূর্ব্বক, এই ব্যাপারকে অভিসম্পাত নামে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

ইঙ্গরেজেরা যখন মুসলমানদের হস্ত হইতে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপার প্রচলিত ছিল; এবং তাঁহারাও নিজে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ লার্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর, এই ব্যাপার, দেশের বিশেষ ক্ষতিকর বোধ করিয়া, ১৭৮৮ সালে, এক বারে রহিত করেন এবং দেশের মধ্যে যেখানে যত পরমিটঘর ছিল, সমুদয় বন্ধ করিয়া দেন। ইহার তের বৎসর পরে, গবর্ণমেণ্ট, করসংগ্রহের নূতন নূতন পন্থা করিতে উদ্যত হইয়া, পুনর্ব্বার এই মাস্তুলের নিয়ম স্থাপন করেন। এক্ষণে লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, সি ই ট্রিবিলিয়ন সাহেবকে, এই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে, আজ্ঞা দিলেন; পরে, ই মাস্তুল উঠাইবার সদুপায় স্থির করিবার নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করিলেন। এই ব্যাপার উক্ত লার্ড বাহাদুরের অধিকার কালে রহিত হয় বটে; কিন্তু তিনি, ইহার প্রা ...ত্যাগী বলিয়া, অশেষ প্রশংসাভাজন হইতে পারেন।